তাহাই। তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৯শের অধিক নয়, তথাপি তাঁহাকে দেখিলে অত্যন্ত বৃদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

আর্ল অফ মাউণ্ট সাভারিণের চরিত্র ভাল বলিয়া খ্যাত ছিল না। কিন্তু তিনি অসাবধান অপব্যয়ী, জুয়াড়ী বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। বুদ্ধির দোষে তাঁহার হৃদয়ের সমুদয় মহৎ গুণগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি যদি পূর্ব্বের অবস্থায় থাকিতেন তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার পক্ষে ভাল হইত।

তিনি ২৫ বৎসর (বয়স অবধি) অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; শৈশব ও পাঠাবস্থা পর্য্যন্ত তাঁহার স্বভাব চরিত্র খুব ভাল ছিল। তিনি ব্যারিষ্টার হইবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিয়া জর্জ্জ ভেন বলিয়া ডাকিত; তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে উইলিয়াম ভেন কালে একজন খুব বড় লোক হইবেন, কারণ তিনি পরিশ্রমী, মেধাবী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু বৃদ্ধ মাউণ্ট সাভারিণের আর্ল তাঁহার একজন আত্মীয় ছিলেন। উইলিয়ম ভেনের আর্ল হইবার সম্ভাবনা কখন ছিল না, কারণ বৃদ্ধ আর্লের তিনজন সবল সুস্থকায় উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু উইলিয়মের সৌভাগ্যক্রমে তাহারা বেশী দিন জীবিত রহিল না। তাহাদের একজন মৃগী রোগে, একজন আফ্রিকার জ্বরে ও তৃতীয় জন অক্সফোর্ডের নৌকায় প্রাণ ত্যাগ করে এবং আইন অধ্যয়নকারী ছাত্র যুবক উইলিয়ম, হঠাৎ দেখিলেন তিনি মাউণ্ট সাভারিণের আর্ল হইয়াছেন, এবং বৎসরে ৬০ হাজার টাকার আইন সঙ্গত অধিকারী হইয়াছেন।

আর্ল উপাধি লাভ করিয়া উইলিয়মের প্রথম মনের ভাব এইরূপ ছিল যে তিনি কখনও অর্থ অপব্যয় করিতে শিখিবেন না। কিন্তু তাঁহার এ সঙ্কল্প অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। বৎসরের পর বৎসর কিছু কাল এই ভাবে কাটিয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বাহিরের লোকের শত তোষামোদেও তাঁহার সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিতে পারিল না। তিনি সকল শ্রেণীর লোকদিগের সঙ্গে মিশিতেন ও সকলের নিকট আদৃত হইতেন। এই সময় তাঁহার নূতন স্বাধীন অবস্থা, ধন ও উপাধির জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া ছিলেন, সর্ব্বোপরি তাঁহার মনমুগ্ধকর আচরণ ও সৌম্যমূর্ত্তি বিশেষরূপে আকর্ষনীয় ছিল। দুর্ভাগ্য, পরিণামদর্শী, সহিষ্ণু, দরিদ্র আইন অধ্যয়নকারী ছাত্র উইলিয়ম ভেন তাঁহার সেই নিভৃত বাস স্থানের মধ্য হইতে অকস্মাৎ আর্ল অফ মাউণ্ট সাভারিণ হইয়া পূর্ব্বের সঙ্কল্প রক্ষা করিতে অক্ষম হইলেন। ক্রমে তাঁর ব্যয় এত বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে দেশস্থ সমগ্র লোকে বলিত তিনি শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবেন। আর্লের এই বিপুল সম্পত্তি কখনও এক দিনে নিঃশেষ হওয়া সম্ভব নহে। যাঁর বৎসরে ষাট হাজার

টাকা আর তাঁহাকে কখন একদিনে দরিদ্র করিতে পারে না। আর্ল তাঁহার পুস্তকাগারে বসিয়া আছেন, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তাঁহার বয়স এখন ৫৯ বৎসর। এখনও তিনি সর্ব্বস্বান্ত হন নাই। এদিকে দৈন বিষে যে তাঁহার দেহ জর্জ্জরিত, বাহিরের কে তাঁহার সে অবস্থা ভেদ করিবে? সাধারণে জানে তাঁহার অবস্থা ভালই আছে. কিন্তু ঋণের করালগ্রাসে তাঁহাকে ধ্বংসের পথে লইয়া আসিয়াছে।

পুস্তকাগারের টেবিলের উপর তাড়া বাঁধা যে সকল কাগজ ছিল তাহার নিকট বসিয়া আর্ল অতীতের কথা ভাবিতে ছিলেন। তাঁহার সেই নির্ব্বোধের ন্যায় বিবাহ। গ্রেট্‌না গ্রীনকে সেই ভালবাসা, যতদূর নির্ব্বোধের কাজ হইবার তা হইয়া ছিল। কিন্তু তাঁর সেই হতশ্রী, অপ্রেম সত্ত্বেও কাউণ্টেস তাঁহার পতিপ্রাণা প্রেমময়ী স্ত্রী ছিলেন। সাধ্বী একটীমাত্র সন্তানের জননী হইয়াছিলেন। আজ ১৩ বৎসর হইল কাউণ্টেস সেই একটী মাত্র সন্তান রাখিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। যদি এই সন্তানটী তাঁহার কন্যা না হইয়া পুত্র হইত তাহা হইলে আজ তাঁহাকে এত চিন্তায় অভিভূত হইতে হইত না। বালক বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পথ দেখিয়া লইত, এবং—(চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল)।

একজন ভৃত্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল "প্রভু, একজন ভদ্রলোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান"।

আর্ল কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন "তিনি কে? তাঁহার নাম লিখাইয়া আন নাই"? তাঁহার পাওনাদারদিগের সম্বন্ধে ভৃত্যদের সাবধান হইয়া চলিবার জন্য শিখান ছিল।

ভৃত্য পুনরায় প্রবেশ করিয়া বলিল "প্রভু", এই তাঁর নাম। ইনি "ওয়েষ্ট-লিনের মিষ্টার কার্লাইল"।

"ওয়েষ্টলিনের মিষ্টার কার্লাইল—" আর্ল গোঁয়াকে গোঁয়াতে এই কথা বলিলেন, কারণ এই সময় তাঁর পায়ের যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া ছিল। "তিনি কি চান? তাঁহাকে উপরে লইয়া আইস।" ভৃত্য আজ্ঞা পাইয়া তাঁহাকে লইয়া আসিল, এবং মিঃ কার্লাইলের সহিত আর্লের আলাপ হইল। কার্লাইল দেখিতে দীর্ঘাকার বয়স অনুমান ২৭ বৎসর, তাঁহার আকৃতি দেখিলেই তাঁহাকে সৎ লোক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তিনি মস্তক অবনত করিয়া নম্রতার সহিত ধীরে ধীরে কথা বলিতেছিলেন। তাঁর স্বভাব একটু স্বতন্ত্র রকমের ছিল, সকলে তাঁহাকে অত্যন্ত অমায়িক বলিত। তিনি তাঁর পিতার স্বভাব পাইয়াছেন লোকে যখন এই কথা বলিত তিনি হাস্য করিয়া বলিতেন তিনি যাহা করেন তাঁহার অজ্ঞাত ভাবেই করেন। তাঁহার আকৃতি অতি সুন্দর, রং একটু ফ্যাকাসে ধরণের, চুলগুলি কাল, সুদীর্ঘ আঁখিপল্লব ও নীল চক্ষু। স্ত্রীলোক এবং পুরুষ সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিত। তিনি একমন

আইন ব্যবসায়ীর পুত্র, পিতার সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি ভদ্র সন্তানের উপযোগী শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। রাগ্‌বিতে শিক্ষা পাইয়া অক্সফোর্ড হইতে উপাধি লাভ করিয়াছেন। এখন আর্লের নিকট একটী প্রয়োজনে আসিয়াছেন।

আর্ল;—মিষ্টার কার্লাইল, আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সুখী হইলাম। আমি পায়ের ব্যথার জন্য উঠিতে পারি না, এই বাত শত্রু আমাকে একেবারে উত্থান শক্তি রহিত করিয়াছে। বসুন! আপনি কি সহরে থাকেন?

কার্লাইল,—আমি এখন ওয়েষ্টলিন হইতে আসিতেছি। আপনার সাক্ষাৎ লাভই আমার এখানে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য।

"আমার নিকট আপনার কি প্রয়োজন?" আর্ল অপ্রসন্ন ভাবে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁর মনে হইল কার্লাইল বুঝি পাওনাদারদিগের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

মিষ্টার কার্লাইল তাঁহার কেদারা আর্লের নিকট টানিয়া আনিয়া আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন।

"মহাশয়, এইরূপ একটি জনরব শুনিতেছি, যে আপনি ইষ্টলিন বিক্রয় করিবেন।"

"মহাশয় এক মুহূর্ত্ত থামুন," আর্ল চীৎকার করিয়া বলিলেন, এবং নিজেও নীরব হইলেন, কারণ তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। তৎপরে উত্তেজিত ভাবে বলিলেন "আপনার কি লোকের সম্মানে আঘাত করা রূপ কোন গুপ্ত অভিপ্রায় আছে, অথবা আপনার প্রশ্নের পশ্চাতে অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে?"

মিষ্টার কার্লাইল বলিলেন "আপনার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

আর্ল "একটী কথা—ক্ষমা করিবেন মহাশয়, আমি সহজ ভাবেই বলিতেছি আমি মনে করিতেছি যে মহাশয়, আমার পাওনাদারদিগের প্রতিনিধি হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন"।

অভ্যাগত উত্তর করিলেন "মহাশয়, আমি জানি উকীলদিগের যাহা কিছু প্রয়োজন পাওনাদারদিগের জন্যই, কারণ তাহাদের জাতীয় ব্যবসাই তাই, কিন্তু আপনি জানিবেন আমি আপনার নিকট সে দোষে দোষী নই। আমার জীবনে এরূপ অপরাধ কখনও হয় নাই এবং আমি মনে করি কখন হইবেও না"।

আর্ল,—মিষ্টার কার্লাইল, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনি যদি জানিতেন যে এই সকল লোক আমাকে কিরূপ উত্ত্যক্ত করিয়াছে, তাহা হইলে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের লোককে সন্দেহ করিলেও আপনি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন না। আপনার কি প্রয়োজন এখন বলুন।"

কার্লাইল,—"আমি শুনিলাম ইষ্টলিন গোপনে বিক্রীত হইবে আপনার দালাল এইরূপ অসম্পূর্ণ কথা আমাকে

বলিয়াছিল। যদি তাহা হয়, আমি ক্রয় করিতে ইচ্ছা করি।"

"কাহার জন্য?" আর্ল জিজ্ঞাসা করিলেন।

কার্লাইল,—"আমার নিজের জন্য।"

"আপনার জন্য!" আর্ল হাস্য করিয়া উঠিলেন। "আপনার ওকালতীর আয় তাহা হইলে মন্দ নয়, মিঃ কার্লাইল।"

কার্লাইল বলিলেন "তাহা নহে," "আমি আমার মাতুলের ও পিতার অনেক সম্পত্তি পাইয়াছি।"

আর্ল,—এ সমস্ত সম্পত্তি ওকালতীর দ্বারা উপার্জ্জন কিনা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

কার্লাইল—না, সব নয়। আমার মাতা তাঁহার বিবাহের সময় কতক টাকা পাইয়াছিলেন, এবং আমার পিতা ব্যবসা দ্বারা তাহার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইষ্টলিন আমার অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছে, উপযুক্ত মূল্য হইলে আমি ইহা ক্রয় করিতে পারি।

লর্ড মাউণ্ট সাভারিণ, ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিলেন। পরে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, "মিঃ কার্লাইল আমার বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়াছে, আমার সমুদয় সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হইয়াছে। এখন ইষ্টলিন খানি কেবল অবশিষ্ট, এখানি আজিও বন্ধক পড়ে নাই। ইহার মত সুন্দর বাড়ী আর কোথাও দেখা যায় না। আপনিও বোধ হয় তাহাই মনে করেন।

আমার স্মরণ হইতেছে ১৮ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন এই বাড়ী ক্রয় করি আপনি তখন ইহার পক্ষে বিক্রেতাদিগের উকিল ছিলেন"।

সে আমি নই, "আমার পিতা", মিঃ কার্লাইল হাসিতে হাসিতে বলিলেন। "আমি সে সময় অত্যন্ত ছোট ছিলাম"।

"তাহাই হইবে, আমি আপনার পিতার কথাই বলিতে ছিলাম নগদ কয়েক হাজার টাকা আমার হস্তগত হইলেই আমি ইহা বিক্রয় করিতে পারি, যখন ইহা আমার হস্ত হইতে যাইবেই। কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছেন, যদি আমার পাওনাদারগণ জানিতে পারে যে ইষ্টলিন আমি বিক্রয় করিতেছি, তাহা হইলে তাহারা আমাকে অস্থির করিয়া তুলিবে। আপনি এরূপ ভাবে ইহা লইবেন যেন এ বিষয় সকলের অজ্ঞাত থাকে। আমার কথা বুঝিতে পারিলেন ত"?

মিষ্টার কার্লাইল উত্তর করিলেন "হুঁ"।

কার্লাইল—আপনার এই সম্পত্তির জন্য কত টাকা দর দিয়াছেন?

আর্ল,—আমার কর্ম্মচারী ওয়ারবর্টনকে না জিজ্ঞাসা করিয়া আমি আপনাকে ঠিক দাম বলিতে পারি না। তবে ৭০ হাজার পাউণ্ডের কম ত নয়ই।

মিষ্টার কার্লাইল "অত্যন্ত বেশী", বলিলেন।

আর্ল উত্তর করিলেন,—"এ মূল্যও তার উপযুক্ত নয়"।

কার্লাইল,—দায়ে পড়িয়া বিক্রয় করিলে ইহার মূল্য এত অধিক হইতেই পারে না। আমি এইরূপ মনে করিয়াছিলাম, বিচাম্পের নিকট হইতেও এইরূপ আভাস পাইয়াছিলাম যে ইষ্টলিন আপনি আপনার কন্যাকে দিবেন।

আর্ল,—আমি তাহাকে কিছুই দিয়া যাইতে পারিব না।

এইসময় তাঁহার সেই অপরিণামদর্শী বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন—"জেনার্ল কনওয়ের কন্যার ভালবাসায় আমি পতিত হই, এবং সেও নির্ব্বোধের মত আমার পশ্চাদনুসরণ করে। পরে দুই জনেই আমরা এই বুদ্ধি হীনতার জন্য দুঃখ পাইয়াছি। জেনার্ল আমার সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিতে আপত্তি করিয়াছিলেন, আমিও বলেছিলাম যে আমি অবশ্য তাঁহাকে দেখাব আমি তাঁর মেয়েকে বিবাহ করিতে পারি কি না। এইরূপে আমি তাঁর কন্যা গ্রেটনাগ্রীনকে লাভ করি, এবং সে কাউন্টেস অফ মাউন্ট সাভারিণ বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হয়। এই বিবাহের অপরাধেই সমস্ত নষ্ট হইল। জেনারল যখন তাঁহার কন্যার পলায়নের কথা জানিতে পারিলেন, তখনই তাঁহাকে হত্যা করা হইল"।

"তাঁহাকে হত্যা করা হইল"? মিষ্টার কার্লাইল বিস্মিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন। "হাঁ" তা ই। তাঁহার হৃদ্‌ রোগ, ছিল, এবং হঠাৎ এই সংবাদে চিত্তের উত্তেজনায় তিনি মারা পড়েন। আমার হতভাগিনী স্ত্রী এ সময় কি কষ্টই না পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর জন্য সেই সম্পূর্ণ দোষী। এবং আমি বিশ্বাস করি তাঁহার নিজের মৃত্যুও এই কারণেই হয়। এক বৎসরের মধ্যে সে পীড়িত হইয়া পড়ে। ডাক্তারেরা বলেন যে তাঁহার ক্ষয়কাশ হইয়াছিল। বাস্তবিক এ রোগ হইবার আর কোন কারণ ছিল না, তাঁহাদের বংশেও এ রোগ কাহার ছিল না। এরূপ বিবাহে কোনও সুখ পাওয়া যায় না। আমি অনেক স্থলে অনেক লোককে দেখিয়াছি যে এই অপরাধের জন্য তাহাদের পরে দুঃখ পাইতে হইয়াছে"। মিঃ কার্লাইল দেখিলেন, আর্ল নীরব হইয়া সেই চিন্তাতে একেবারে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছেন।

আর্ল,—আমি কন্যার জন্য যে কিছু রাখিতে হইবে জানিতাম, কিন্তু রাখি নাই। আমার স্ত্রীর কোন বিষয় সম্পত্তি ছিল না। আমিও অত্যন্ত ব্যয় করিতাম। আমরা তখন আমাদের ভাবি সন্তানের জন্য ভাবি নাই ও কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখি নাই। মিঃ কার্লাইল, একটা প্রবচন আছে, সেটী এই যে, যে কাজটা যখন হ'ক করা যাইতে পারে, এরূপ যদি হয় সে কাজ কখনও সম্পন্ন হয় না"।

কার্লাইল মস্তক অবনত করিয়া বলিলেন "এ কথা সত্য"।

আর্ল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "এই কারণেই আজ আমার কন্যা কপর্দ্দক হীনা। তার জন্যই আমার এখন ভাবনা। আমি এমন মূঢ়, আজ যদি আমি মারা যাই, আমার কন্যা কোথায় দাঁড়াইবে তাহার ঠিক নাই। তবে আমার এই একমাত্র আশা আছে যে, সে ভাল পাত্রে বিবাহিতা হইবে, কারণ সে ইংরাজ মহিলাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান সুন্দরী বলিয়া খ্যাত। সে সুশিক্ষিতা, তার যার নিকট হইতেও সে সংশিক্ষা পাইয়াছে, তাহার মা অতি শান্ত ও নির্ম্মল অন্তঃকরণ ছিলেন। পরে একজন সুশিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রীর নিকট শিক্ষা পাইতেছে। সে যে গ্রেটনা গ্রীণের মত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই"।

আগন্তুক বলিলেন, "সে ছোট বেলায় অতি সুন্দর দেখিতেছিল, আমার যেন এই রকম স্মরণ হচ্ছে"।

আর্ল,—"হাঁ, আপনি তাহাকে ইষ্টলীনে দেখিয়াছেন, তাহার মা তখন জীবিত ছিলেন"। তৎপরে তিনি বাড়ীর কথা পাড়িলেন। "মিঃ কার্লাইল, আপনি যদি ইষ্টলিন ক্রয় করেন তাহা হইলে টাকা আনিবেন, এবং দেখিবেন ইষ্টলিন হস্তান্তর হইয়াছে একথা যেন কেহ না জানিতে পারে। লর্ড মাউন্ট ভাসারিণ এখনও ইষ্টলিনের অধিকারী এও যেন সাধারণে জানে—অবশ্য ইহা অল্প দিনই গোপন রাখিতে হইবে। ইহাতে আপনার কোনও আপত্তি নাই ত"?

মিষ্টার কার্লাইল তাহাতে সম্মত আছেন বলিলেন। কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া উঠিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। আর্ল বলিলেন, "আপনি যদি আমাদের সঙ্গে আহার করিয়া যান, তাহা হইলে সুখী হইব"।

মিষ্টার কার্লাইল দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া নিজের পোষাকের দিকে তাকাইলেন। তাঁহার পরিধানে ভদ্রলোকের উপযোগী সাদাসিধা সকাল বেলার পরিচ্ছদ ছিল। তিনি মধ্যাহ্ন ভোজনের উপযোগী পরিচ্ছদের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না।

আর্ল বলিলেন "ওঃ, সেজন্য কিছু মনে করিবেন না, এ বাটীতে আমি ও আমার কন্যা ব্যতীত আর কেহ নাই। কাসল মারলিংয়ের মিসেস ভেন, এক আমাদের এখানে আছেন, তা তিনি এখন শেষের দিককার বসিবার ঘরে আমার মেয়ের সঙ্গে রহিয়াছেন। আমি শুন্‌ছিলাম তাঁহার আজ অন্যত্র নিমন্ত্রণ আছে। যদি তাহা না হয় আমরা এইখানেই আহার করিব। মিষ্টার কার্লাইল, অনুগ্রহ করিয়া ঘণ্টাটা বাজাইয়া দিলে বাধিত হইব।

ভৃত্য প্রবেশ করিল"।

আর্ল জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিসেস্ ভেন কোথায় আহার করিবেন"। ভৃত্য উত্তর দিল, "মিসেস ভেনের অন্যত্র নিমন্ত্রণ আছে মহাশয়। তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য দরজায় গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে"।

"ভাল হইয়াছে। মিষ্টার কার্লাইল আপনি তাহা হইলে থাকুন"। সাতটার সময় আহার প্রস্তুত হইল। আর্ল ও মিঃ কার্লাইল আহার গৃহে যেমন প্রবেশ করিলেন, ঠিক সেই সময় অপর দিককার দ্বার দিয়া আর একজন প্রবেশ করিল। কে—এ কোথায় ছিল? মিঃ কার্লাইল চাহিয়া রহিলেন, ইহাকে মানুষ বলেত মনে হচ্চে না, তিনি মনে করিতেছিলেন এ যেন একটি পরী।

একটি সুন্দরী বালিকা, মুখখানি অতুলনীয় সুন্দর, এরূপ সৌন্দর্য্য প্রায় দেখা যায় না ঠিক যেন তুলি দিয়া আঁকা। কাল কুচকুচে কোঁকড়া কোঁকড়া চুল স্কন্ধের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েচে, শিশুর মত সরল মুখ, সুন্দর হাত দুইখানি মুক্তার অলঙ্কারে শোভিত, পরিধানে সাদা লেসের পোষাক। উকীল মহাশয়ের মনে হইল তিনি যেন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরীকে স্বপ্নে দেখিতেছেন।

আর্ল—"মিষ্টার কার্লাইল,এইটী আমার কন্যা লেডী ইজাবেল"। ইজাবেল তাঁহার আসনে উপবেশন করিলেন। প্রথমে লর্ড মাউন্ট সাভারিণ বাতগ্রস্ত পাটী একটি টুলের উপর রাখিয়া বসিলেন, যুবতী লেডী ইজাবেল ও মিঃ কার্লাইল দুইজনে সম্মুখ সম্মুখী বসিলেন। মিষ্টার কার্লাইল নিজেকে রমণীদিগের সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী মনে করিতেন না, কিন্তু আজ এই যৌবনোম্মুখ বলিকার সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সরলতাপূর্ণ সুন্দর মুখ, কোমল গোলাপী আভাযুক্ত গণ্ডস্থল, কুঞ্চিত কেশ নধর ছিপছিপে গঠন, এই সকলের জন্য তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখাইতেছিল। তার সেই কমলতাপূর্ণ কৃষ্ণতার চক্ষু দুটি সর্ব্বাপেক্ষা নয়ন মনমুগ্ধকর। তাঁহার জীবনে এমন সুন্দর চক্ষু তিনি কখন দেখেন নাই। তিনি একাগ্রচিত্তে তাহার প্রতি চাহিয়াছিলেন। তাঁহার বোধ হইতেছিল তাহার মুখে যেন দুঃখের ছায়া পতিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টিও যেন দুঃখপূর্ণ। কিন্তু সকল সময় তাহা বুঝা যায় না। যখন সে স্থির ভাবে চাহিতেছিল তখনই ইহা প্রতীয়মান হইতেছিল; কিন্তু মিঃ কার্লাইল বুঝিতে পারিলেন না এই সরল নির্দ্দোষী সুন্দরী ইজাবেলের দুঃখের কারণ কি?

আর্ল জিজ্ঞাসা করিলেন "ইজাবেল, তুমি কি বাহিরে যাইবার পোষাক পরিয়াছ"?

ইজাবেল,—হাঁ বাবা। বৃদ্ধা মিসেস্ লিভসনের চা খাবার দেরী করিতে ইচ্ছা করি না। তিনি সকাল সকাল চা খাইতে ভাল বাসেন, এবং আমি জানি মিসেস্ ভেলও তাঁহার আহার লইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি যখন এখান হইতে যান তখন ছয়টা বাজিয়া গিয়াছিল।

আর্ল—ইজাবেল, আমি আশা করি তুমি আজ রাত্রিতে ফিরিতে অধিক বিলম্ব করিবে না।

ইজাবেল,—ইহা মিসেস্ ভেনের উপর

নির্ভর করিতেছে।

আর্ল তুমি কি করিবে তা আমি ঠিক বুঝেছি। যখন এই যুবতীদের রাত্রি দিন ফ্যাসানের পশ্চাতে ঘোরার কথা মনে হয় তখন মন বড় চিন্তাকুল হয়। মিঃ কার্লাইল, আপনি কি বলেন?

মিঃ কার্লাইল তখন অপর দিকে সুন্দরীর রক্তিম গণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি দেখিলেন তাহার প্রস্ফুটিত উজ্জল মুখে একটি ম্লান ছায়া পতিত হইয়াছে।

আহার শেষ হইতেই একজন পরিচারিকা একখানি শ্বেতবর্ণ কাশ্মিরী গাত্রাবরণ লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। যুবতীর স্কন্ধে সেই খানি রাখিয়া বলিল, গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে।

লেডী ইজাবেল অগ্রসর হইয়া পিতাকে নমস্কার করিল।

আর্ল তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহার সুন্দর মুখখানিতে চুম্বন করিয়া বলিলেন, 'প্রাণাধিকে কন্যে! তোমার মঙ্গল হউক।'

"মিসেস্ ভেনকে বলিও আমি সকাল পর্য্যন্ত তোমাকে সেখানে রাখিতে পারিব না, তুমি আমার একমাত্র সন্তান। মিঃ কার্লাইল, অনুগ্রহ করিয়া ঘন্টাটা বাজাইয়া দিবেন? আমার মেয়েকে কেহ গাড়ীতে তুলিয়া দিতে না গেলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।

আপনি যদি অনুমতি করেন এবং লেডী ইজাবেল যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আমি তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি, এই বলিয়া মিঃ কার্লাইল ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেন।

আর্ল তাঁহার এই সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ দিলেন, যুবতীও হাসি মুখে তাঁহার দিকে তাকাইলেন। কার্লাইল তখন তাহার সহিত সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া অবতরণ করিলেন। বাহিরে মাথা-খোলা একখানি সুন্দর চেরেট দাঁড়াইয়া ছিল। যুবতী তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া ও অভিবাদন করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। গাড়ী গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল, কার্লাইল আর্লের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

আর্ল বলিলেন, কেমন আমার কন্যা —কি সুন্দরী নয়?

কার্লাইল আস্তে আস্তে বলিলেন, ইঁহার মত সুন্দরী বোধ হয় আর নাই। ইঁহার সৌন্দর্য্যের অর্দ্ধেকও আমি কোথাও দেখি নাই।

আর্ল—শুনিলাম গত সপ্তাহের এক সভাতে সে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই সর্ব্বনেশে বাতের জন্য আমি তথায় উপস্থিত থাকিতে পারি নাই। সে যেমন সুন্দরী তেমনি গুণবতী।

আর্ল নিজের মেয়ে বলিয়া যে এত প্রশংসা করিতেছেন তাহা নহে। লেডী ইজাবেলের স্বভাব বাস্তবিক আশ্চর্য্য রূপ

মধুর ছিল। কেবল যে তাঁহার মন ভাল ও দেখিতে সুন্দরী, তাহা নহে, তাহার অন্তঃকরণ ও অতি মহৎ। সে তাহার সৎশিক্ষা ও পল্লীগ্রামে বাসের জন্য নগরবাসিনী বালিকাদিগের ন্যায় ভোগ বিলাসী হয় নাই। তাহার মাতা যখন জীবিত ছিলেন তখন সে কখন কখন ইষ্টলিনে থাকিত, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই আর্লের নিকট মাউন্ট সাভারিণে থাকিত। তাহার মাতার মৃত্যুর পর হইতে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষয়ত্রীর অধীনে মাউন্ট সাভারিণেই বাস করিতেছে। এখানে তাহাদের জন্য অতি সামান্য তৈজস পত্র ছিল। আর্ল মাঝে মাঝে তাহাদের কাছে আসিয়া থাকিতেন। ইজাবেল মহৎ হৃদয়, পরোপকারী, লজ্জাশীলা, বিবেচক, শান্ত ও গম্ভীরপ্রকৃতি ছিল। পাঠিকাগণ তাহাকে প্রশংসা করিতে বারণ করিও না, যতক্ষণ পার তাহাকে প্রশংসা কর, কারণ এই নিষ্কলঙ্ক বালিকা এখন প্রশংসার যোগ্য। অবশ্য এমন সময় আসিবে যখন আর তাহাকে এরূপ প্রশংসা করা যাইবে না। আর্ল পূর্ব্বে যদি তাঁহার প্রিয়তমা কন্যার পরিণাম জানিতে পারিতেন তাহা হইলে শৈশবেই তাহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিতেন।

বামাবোধিনী পত্রিকার ত্রিপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত।

তুমি গো "বামাবোধিনী, পত্রিকা"-ব্রত
চারিণী,
তোমায় জীবনে দেখি করুণা অপার ;
ভক্তের মানসী কন্যা, আজ তুমি হ'লে
ধন্যা,
তোমার এ জন্মোৎসবে স্মরি শত-বার।
বাহান্ন বৎসর হেন, জীবিত রয়েছ কেন ?
কার তরে প্রেম-অশ্রু ঝরে অনিবার ;
কোথা পিতা প্রেমময় ? দাও তাঁর পরি-
চয়,
চির-কল্যাণ-দায়িনি ভগি'নে আমার!

ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত তব, এ যে দেখি অভিনব,
তোমার নির্জীব প্রাণে খেলে চমৎকার ;
নহ তুমি আশা-হত, সদা প্রেমে হও রত,
খুলে এই বিশ্বময় প্রেমের ভাণ্ডার।
শিখায়েছ কত তুমি, আত্মার প্রতিষ্ঠা
ভূমি,
জ্ঞানের বিকাশ এই মানব অন্তরে ;
যাঁহার পূজার অর্ঘ্য, আনে সবে প্রজাবর্গ,
লয়ে তাই সাজাইছ অতি সমাদরে।
লইয়া বরণ-ডালা, পরাও যতনে মালা,
আর ত নাহিক হেরি দীনাবঙ্গভারা ;

সোদর-সোদরা তব, 　মোরা আজি কিবা কব।

শুভ দিনে জাগে প্রাণে এই নব আশা—
প্রাণের ভগিনী তোরে, 　চিরদিন থাকি ধরে,
সতত পুণ্যের পথে চলে যাই সোজা ;
অনন্ত করুণাধার, 　বিশ্বপতি বিশ্বাধার !
তাঁরে যেন হয় সত্য এ জীবনে বোঝা।
হও তুমি আয়ুষ্মতী, ভগিনি গো পুণ্যবতি,
দেব আশীর্ব্বাদ তুমি লভিয়ে গো আজ।
তোমার জীবন-ব্রত, 　সার্থক করিবে কত,
ধন্য কৃতকৃত্য হবে রমণী-সমাজ।

আমাদের কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সরলা।

কি ঘৃণার কথা! দাদা আমার আবার বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছেন! প্রথমে এক-বার বাবার কাছে বকুনী খাইয়া চুপ করিয়াছিলেন। এখন বাবা ও মা স্বর্গা-রোহন করিয়াছেন, দাদার ঘাড়ে সংসার, সেদিকে দৃক্‌পাত নাই. হাতে কত রোগী, সেগুনা দেখি এক বিন্দু চিন্তা নাই, এখন কিনা কোথাকার সব পণ্ডিতদের কাছ থেকে ব্যবস্থা আনাইয়াছেন, কত হাঁটা হাঁটি, ছুটাছুটি, ঝটাপটি আরম্ভ করিয়া-ছেন। তাঁর খেয়ে দেয়ে আর কাজ নাই! ছি, ছি, ছি, ঘৃণায় মরি। যমরাজ! এত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছ, এ হত-ভাগিনীর দিকে একবার ফিরিয়া চাও না কেন? ধিক্ আমার জীবনে, গলায় দড়ি আমার!

মনের এই ভাব, এমন সময় বিবাহের কথাটা চাপা পড়িল——বাঁচিলাম।

এখন কি করি? কোথায় যাই? আমার কি কোন কর্ত্তব্য নাই? আমি সংসারে কি করিতে আসিয়াছিলাম? কি বা করিতেছি? মেজদিদি ও দাদার কাছে কিঞ্চিৎ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিখিয়াছি, নিজ গ্রামের ও ভিন্ন গ্রামের মেয়েরা আসিলে ঔষধ দিয়া থাকি, আর দাসীর মত সংসারের সমস্ত কার্য্য করি। জীবন পাত করিয়া তিন বৎসর বৌ-দিদির কাজ করিতেছি—তবুও বৌ-দিদির মন পাইলাম না!—সদাই মুখ ভার করিয়া থাকেন, আমি দুটা খাই তাও যেন তাঁর গায় সয় না। ঈশ্বর! যদি সবই লইলে, পোড়া পেটটা কেন রাখিলে? দুপরে ও সন্ধ্যার পরে মেজদিদির কাছে গিয়া একটু পড়িতাম শুনিতাম, তাহাও বৌ-দিদির সহ্য হইল না। তিনি দাদাকে বলিলেন, আমি রাত্রিদিন পাড়ায় পাড়ায় বেড়াই। দাদা আমার সহোদর, আমায় চিনেন, তবু বৌ-দিদির মান রাখিবার জন্য তাঁহাকে বলিলেন, আচ্ছা আমি বারণ করিয়া দিব।

দাদা গো! আমায় বারণ করিতে হইবে না, আমি আর তোমার বাড়ীর বাহির হইব না। সেই অবধি আমি আর মেজ-দিদির কাছেও যাইতাম না। মেজদিদি ও দাদা বাবু এক দিন না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, "সময় পাই না আর আমি না থাকিলে খুকী (দাদার একটী মেয়ে হইয়াছে) বৌদিদিকে জ্বালা-তন করে, তাঁর কষ্ট হয়," তাঁহারা সব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বলিলেন "আচ্ছা"

বৌদিদি কোন কাজ কর্ম্ম করিতে পারেন না। তিনি তাঁর মায়ের ছোট মেয়ে, এজন্য কাজ কর্ম্ম করিতে দিয়া তাহা অভ্যাস করান উচিত মনে করেন নাই। এখানে বিধবা ননদ আছে—কোন চিন্তা নাই।

পাড়ায়, গ্রামে, কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে, কোন মাঙ্গলিক ক্রিয়ার সময় আমি উপস্থিত থাকি না—কি জানি, যদি এ অভাগিনীর উপস্থিতি কোন অমঙ্গল ডাকিয়া আনে! পোড়ার মুখ করিয়া, চুপটি করিয়া, বাড়ীতে বসিয়া থাকি। বাড়ীতে কেহ আসিলে একটু শুক আপ্যায়িত করি। কাহারো কষ্টের কথা শুনিলে, কাহারো ছেলে মরিয়াছে শুনিলে, কাহারো মেয়ে বিধবা হইয়াছে শুনিলে, মন দিয়া শুনি, বুঝিতে পারি, দুঃখ হয়, কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলিয়া বড় একটা সমবেদনা জানাই না। কি জানি, যদি কেহ মনে করে 'এর বুঝি আপনার বৈধব্যে বড় দুঃখ হইয়াছে, বুঝি সুখী হইতে মনে বাসনা ছিল; ছিঃ, সে বড় লজ্জার কথা। আমি যে বিধবা, আমার আবার সুখ দুঃখ? ধিক্! হাসির কথা হইলে একটু হাসি, নহিলে বেয়াদবী হয়; কিন্তু আমার সে হাসি মেঘাবৃত চন্দ্র কিরণের মত—ক্ষীণ, ম্লান। সুখের কথা উঠিলে, আনন্দের কথা উঠিলে, উৎসব-সম্ভোগের কথা উঠিলে, প্রায়ই ছুতা নাতা করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া যাই,—এ সকল প্রসঙ্গ যে সংক্রামক। এ সকল শুনিলে যে কত পূর্ব্ব স্মৃতি আবার মনে জাগিয়া উঠিতে চাহে, কত বিসর্জ্জিত আশা আবার যে মাথা ভাসাইয়া উঠিতে চাহে, কত কাল্পনিক সুখের কল্পনা আবার যে বিরক্ত করিতে আসিতে চাহে। আমাকে যে ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইবে, আমি যে দুর্ব্বল, আমি যে কলিকালের সামান্যা, রক্ত মাংস গঠিতা, অবগুণ্ঠন-প্রাপ্তা নারী। আমার কতটুকু বল? শত্রুর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করা আমার সাধ্য নহে, তাই পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করি। যদি কখনও বল সঞ্চয় করিতে পারি, তখন নির্ভয়ে শত্রু সম্মুখীন হইব। তাই এখন সুখের প্রসঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে চাই। আমি "কিছুই না" "কেহই না" হইয়া থাকিতে চাই। পৃথিবীতে সুখ দুঃখ দুইই আছে জানি, কিন্তু আমি যে বিধবা,—আমার যে দুঃখ জীবনের সঙ্গী, দুঃখই যে আমার দুঃখের পরিণাম, দুঃখেই যে আমার সুখ, দুঃখেই যে আমার অধিকার। তাই সুখ দেখিলে, সুখের

কথা শুনিলে ভয় হয়, পালাইতে ইচ্ছা হয়। সুখ আছে জানি,—কিন্তু তার রাজ্যে আমার স্থান কোথায়?—আমি তার কে?

(২)

এক বেলা হবিষ্যান্ন আহার করি, হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করি, স্বাস্থ্যের প্রতি যতদূর পারি অবহেলা করি, তবুও পোড়া শরীর যেন দিন দিন হাতীর মত হইতেছে, এ বালাই চুলের বোঝাও আর বহিতে পারি না। সে দিন কাঁচি লইয়া বসিলাম, ভাবিলাম বৌদিদির মাথায় একেতো চুল ছিলই না, তার উপর খুকী হওয়ার পর থেকে যে কয়টা ছিল তাহাও উঠিয়া গিয়াছে—চুল বাঁধিতে গিয়া কান্না পায়, ঐজন্য মেজদিদি বৌ-দিদির মাথায় হাতই দিতে চান না, বলেন "ঐ শিয়ালের ল্যাজ তুই পারিস্ বাঁধ, আমি ও পারবোনা।"—ভাবিলাম আমার চুলগুলা কাটিয়া তাঁর জন্য গুছি করিয়া দিব, এ ছাই চুল লইয়া আমি আর কি করিব? আমার মাথায় চড়িয়া বসিয়া থাকিয়া এরা কি করিবে? তার চেয়ে বরং সদ্ব্যবহার হউক। এই ভাবিয়া বসিয়াছি পোঁচ লাগাইব বলিয়া এক গোছা ধরিয়া কাঁচির গালের ভিতর পুরিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে দাদা আসিয়া উপস্থিত। দাদা দেখিয়া সবই বুঝিলেন। তিনি বারণ করিলেন, বলিলেন "আমার কথা শুনবি না সরলা?"—আমার সাধ্য কি? আমার দাদা বলিলে আমি অম্লান-বদনে তুষানলে দগ্ধ হইতে পারি—আমার যে দাদা।—চুল কাটা হইল না।

কিন্তু বৌদিদি রাত্রিদিন আমায় অমন করেন কেন? আমি তাঁর কি করিয়াছি? সে দিন দুপর বেলা বৌদিদি খুকীকে লইয়া খাটের উপর ঘুমাইতেছেন, আমি নিচে শুইয়া "প্রভাস" খানা লইয়া একটু পড়িতেছি, পড়িতে পড়িতে বইখানা বুকে করিয়া একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, খুকী উঠিয়া গিয়া বাহিরে দুরন্তপনা করিতেছে। দাদা অপরাধের মধ্যে আসিয়া বৌদিদিকে বিনীত ভাবে বলিলেন, "নিজের ছেলে পুলেকে একটু নিজে দেখা ভাল," আর যাবে কোথায়? যত রাগ আমার উপর। অর্থাৎ আমার উচিত ছিল, না ঘুমানো, এবং যদিও বা দুর্ভাগ্যক্রমে ঘুম আসে, তবে কোন অনৈসর্গিক ক্ষমতা বলে ঠিক খুকীর ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে জাগ্রত হওয়া। তাহা যদি না পারিব তবে বিধবা হওয়াই বা কেন, আর যদি বা বিধবা হওয়া, তবে তাঁর সংসারে থাকিতে আসাই বা কেন?

আবার সেদিন কাদীর মা আসিয়া কাঁদিয়া বলিল, তার কাদীর কাপড় নাই, লজ্জা নিবারণ হয় না, যদি একটু ছেঁড়া-ফুটা কাপড় পায়, পরিয়া বাঁচে। আমি দুঃখ বুঝিতে পারি, আমার থান কাপড় দিলেই বা কি করিব? এইজন্য বৌদিদির একখানি জীর্ণ বস্ত্র তাঁর বিনা অনুমতিতে তাকে দিয়া ফেলিলাম। তাঁর অনুমতি লই নাই, অন্যায় করিয়াছিলাম, কিন্তু ক্ষমা কি নাই? তা না, বৌদিদি ঠেস্

দিয়া ঠেস্ দিয়া কত কথা না বলিলেন? তিনি বল্লেন "বেশতো, বেশতো, নিজের ভাইয়ের সংসার, বাপের সংসার, যাহা ইচ্ছা তাই করিবেই তো—ভাইয়ের আদুরে বোন, সুন্দরী বোন, আমি শালী ভাসিয়া আসিয়াছি"—ইত্যাদি ইত্যাদি। মাঝে মাঝে আমাকে সুন্দুরী 'রূপুষী' ইত্যাদি বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া যেন তাঁর কি তৃপ্তি হইত। তাঁর ঐ কথা শুনিয়া মনে হইত এক দিন কড়ার তপ্ত তৈল দিয়া এ মুখ খানা পোড়াইয়া ফেলি, তাহ'লে আর বৌদিদির বিদ্রূপ বুঝি সহিতে হইবে না। ইহাতে মনে বড় দুঃখ হইল, কান্না আসিল, বৌদিদির পা দুই খানি ধরিয়া বলিলাম—"বৌদিদি! কখনও দুঃখ পাও নাই, তাই বুঝি অন্যের দুঃখ বুঝিতে পার না? আমি যে বড় দুঃখিনী, আমায় আশ্রয় দিলে তোমার পুণ্য হইবে, আমি হতভাগিনী, চিরদুঃখিনী, পথের কাঙ্গালিনী, ভিখারিনী। আমি তোমার ছোট, আমায় তুমি ক্ষমা কর, তুমি আমায় যা বলিবে আমি তাই করিব, আমায় প্রতি আর মুখ ভার করিও না, আমার বড় কান্না আসে—আমার যে আর কেহ নাই বৌদিদি—"। বৌদিদি আমার কথা শুনিলেন না, "থাক্—মায়া কান্নায় আর কাজ নাই"—বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

আমিতো জানি না, কিন্তু আমার বোধ হয়, যাঁরা সুখী, তাঁদের সুখের মাঝখানে দুঃখের চিন্তাও বুঝি স্থান পায় না, দুঃখীর দুঃখ তাঁদের বুঝিবারও বুঝি অবকাশ নাই, দুঃখীর কাতর ক্রন্দন শুনিলে বোধ হয় তাঁহাদের বিরক্তি বোধ হয়, রাগ হয়।

বৌদিদি রাত্রিদিন খিট্ খিট্ করেন, এ কথা আমি দাদা বা মেজদিদিকে কখনও বলি নাই—বলিতে ইচ্ছাও করি নাই, বুঝিবা বলিতে সাহস ও হয় নাই। আজ কাল মেজদিদি বড় একটা আমাদের বাড়ীতে আসেন না। দাদাবাবু তো আসেনই না—যদি বা আসেন, তা বাহিরে ডিসপেন্সরিতেই বসেন, বাড়ীর ভিতরে আসেন না। আমি যখন যে পুস্তক চাহিয়া পাঠাই, তিনি তাহা পাঠাইয়া দেন। দাদাতো সর্ব্বদাই রোগী দেখিয়া বেড়ান।

৩

সংসারের কায কর্ম্ম তো করি, মেজ দিদির লাইব্রেরী হইতে পুস্তকাদি আনিয়া যখন সময় পাই পড়ি, ইংরাজি পড়া ছাড়িয়াছি, ইংরাজি পড়িয়া আর কি হইবে? ও সব এখন ভুলিয়া যাওয়াই মঙ্গল। বাংলাই পড়ি, রাত্রিতে সকলে ঘুমাইলে আপনার ঘরে শুইয়া শুইয়া পড়ি। আহুরী আমার ঘরে শোয়, শুইতে না শুইতেই তার নাসিকা গর্জ্জন আরম্ভ হয়, আমার শীঘ্র ঘুম আসে না,—আমি পড়ি।

এক দিন মেজদিদির আলমারি খুঁজিতে খুঁজিতে এক খানি পুস্তক পাইলাম—"বিধবা-বিবাহ!" ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। কি সর্ব্বনাশ! বি—ধ—বা—র বি—বা—হ? এ পুস্তক পড়িবার জন্য

যত উৎকণ্ঠা হইল, তত উৎকণ্ঠা বোধ আর কখনও আমার হয় নাই। কিন্তু আশঙ্কা—দাদা বা মেজদিদি পাছে জানিতে পারেন। শেষে উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ ভয়কে দূরে নিক্ষেপ করিল। বইখানি লুকাইয়া আনিয়া বিছানার নীচে লুকাইয়া রাখিলাম। পূর্ণ এক সপ্তাহে তাহাকে সমাপ্ত করিলাম। চক্ষু ফুটিল। কি রকম ফুটিল? বলিব না—

আজ চারি দিবস মেজদিদির বাড়ীতেই আছি। আমার সত্য সত্যই বিবাহ। দাদা এবং মেজদিদি অনেক বুঝাইলেন, আমি পড়িয়াছি তাহা না জানায় আমায় আবার "বিধবা-বিবাহ" পড়াইলেন, দত্ত মহাশয় লেকচার দিয়া তাহা ব্যাখ্যা করিয়া আমায় সব বুঝাইলেন—তথাপি আমি রাজি হইলাম না। আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম, মেজদিদির বিবাহে আন্তরিক মত ছিল না, কিন্তু দাদা ও দাদাবাবুর মনক্ষুণ্ন করিবার ভয়েই তিনি আমাকে প্ররোচিত করিতেছেন। দাদাবাবু সমাজ-সৃষ্টি, সমাজরক্ষা এবং শাস্ত্র এ সকলের সম্বন্ধ আমায় বিশদরূপে বুঝাইলেন—তথাপি আমি রাজি নহি। তখন দাদা কাঁদিয়া বলিয়া ফেলিলেন তিনি হয় আত্মঘাতী হইবেন নয়তো সংসার ছাড়িয়া যাইবেন। আমি—কি জানি কেন—"মৌনং সম্মতিলক্ষণং" প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। তখন বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল। শুনিলাম আমাদের গ্রামের ও সমাজের প্রত্যেক শিক্ষিত যুবক বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, দাদাকে সমাজে রাখিবেন। দাদাকে সকলেই ভাল বাসেন। ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রত্যেক যুবক তো দাদার পক্ষে আছেনই,—উপরন্তু অনেক বয়স্থ ব্রাহ্মণ-কায়স্থও ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন। অপরাপর লোকেদের এঁরা 'কেয়ার' করিবেন না। বুঝিলাম দাদা এতদূর করিয়া তুলিয়া তবে আমায় জানিতে দিয়াছেন, তাই সেদিন আমার চুল কাটিতে দেন নাই। বৌদিদির আমার প্রতি ব্যবহার এঁরা জানিতেন, তথাপি সব চুপ চাপ ছিলেন, সব দিক বাঁধিয়া লইয়া এখন আমার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

একটা কথা মনে পড়িল। যখন বাবার মৃত্যু হয়, তাহার মাস দুই পরে কে এক জন কতকগুলা নিমন্ত্রণ পত্র ছাপাইয়া গ্রাম-ময় বিলি করিয়াছিল "প্রফুল্লর বিধবা মায়ের বিয়ে" অর্থাৎ দাদা প্রথমে সেই যে আমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বাবার কাছে বকুনি খান, তারই উপর বিদ্রূপ। দাদা তখন কলিকাতায় গিয়াছিলেন। দাদা বাবু তাড়াতাড়ি সমস্ত পত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া পোড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং গ্রামের প্রত্যেককে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে "প্রফুল্ল বাড়ী আসিয়া এর নাম ও না শুনিতে পায়, তাহা হইলে কোন নিরপরাধ প্রাণ হারাইবে, কারণ তাহার যারই উপর সন্দেহ হইবে, তাকেই সে হত্যা করিবে—তা তিনি যত বড়ই আত্মীয় লোক হোউন।

সে কাপুরুষ নহে—ফাঁসির ভয় রাখে না?" এই করিয়া রাখিয়া তারপর একদিন তিনি বন্ধু বান্ধবদের কাছে বলিলেন "আমি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দিতে পারি যে সে এই বিদ্রূপ করিতে পারিয়াছে, সে নিশ্চয়ই Bastard (বেজাতক) কখনই সুজাতক নহে—সুজন্মার কখনও এমন মতি গতি, এমন একটা বিদ্রূপ মনে আসিতেই পারে না।" অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, এ আমাদের গ্রামের নায়েব মহাশয়ের কাজ। দাদা বাবুর কি আশ্চর্য্য বুদ্ধি! বাস্তবিকই নায়েব মহাশয়ের মাতার কলঙ্ক থাকায় তিনি তাঁদের সমাজে একঘরে ছিলেন, অনেক দিন তাঁর বিবাহ হয় নাই, শেষে অনেক টাকা খরচ করিয়া জাতে উঠেন (টাকায় সব হয়)। তারপর বিবাহ হয়. দাদা বাবু এ সমস্ত সন্ধানে জানিতে পারেন। তিনি দাদাকে এ সব কিছু জানিতে দেন নাই, তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যা হইত—নায়েব মহাশয় ব্রাহ্মণ। আমি মেজদিদির চাকরানী হিমীর কাছে এসব শুনিয়াছিলাম।

৪

আমার কথা বলিব?—অবশ্য বলিব, হৃদয়ের কপাট তো খুলিয়াছি, কেন না বলিব? শুনিয়াছি নিজের পাপের কথা লোক সমক্ষে ব্যক্ত করিলে পাপ ক্ষয় হয়,—তাহাই হউক—তাই আজ আমার জীবন কাহিনী লিখিয়া যাইতেছি।—নহিলে কি আবশ্যক?

মেজদিদির বাড়ীতে আসা অবধি আমার বাহিক ও আন্তরিক সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে।—সম্পূর্ণ ভাবান্তর হইয়াছে। অন্তরের ভাবের কথা কেহ বুঝিবে না। সে অবস্থায় আমাদের সমাজের কাহাকেও বুঝি আজিও পড়িতে হয় নাই—লোকে কেমন করিয়া বুঝিবে? সে ভাবের মধ্যে নাই কি? এমন কি দুঃখও যেন একটু রূপান্তরিত হইয়া আছে;—আর আছে, আশা, আহ্লাদ, সুখ-কল্পনা, সুখ-স্পৃহা, আছে একটু ভয়, একটু ত্রাস, একটু সঙ্কোচ; আরও আছে খানিকটা কি হবে কি হবে ভাব, কি হলো কি হলো ভাব, একটু না হলেও বুঝি ছিল ভাল ভাব; আর আছে সর্ব্বোপরি, সর্ব্বব্যাপী, তীব্র লজ্জা। এই ভাবগুলির মধ্যে যেন অনবরত লড়াই চলিয়াছে,—কে উপরে উঠিবে, এ লড়াইয়ের কারণ কি, বুঝিতে চেষ্টা করিলাম—বুঝি সংস্কার। মনের উপর সংস্কারের যত প্রভুত্ব, এত আর কাহার?

লজ্জা করিব না, সব বলিব—পাপ ক্ষয় হউক। আমি এখন সর্ব্বদা বেশ সাজ সজ্জা করিয়াই থাকি, মেজদিদি সর্ব্বদা আমায় ফিটফাট রাখিতে ব্যস্ত, কিন্তু একটী বারও বাড়ীর বাহির হইতে দেন না, বাড়ীতে কেহ আসিলে আমায় লুকাইয়া রাখেন, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ একেবারে নিষেধ। সকাল সন্ধ্যা খিড়কীর বাগানে পুকুর পাড়ে গিয়া একটু বসি,

বাড়ীতে বসিয়া এটা ওটা পড়ি, আর মাঝে মাঝে (এখন মনে হইলে গা শিহরিয়া উঠে, ঘৃণায় আত্মঘাতিনী হইতে ইচ্ছা হয়,) দর্পনের সম্মুখে যাইয়া আপনার রূপ দেখিয়া অহঙ্কারে ফাটিয়া যাই। কত রকম অঙ্গ-ভঙ্গি করি, কত কায়দায় অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া রূপের সাগরে ঢেউ তুলি, —বৃহৎ দর্পণে তাহা প্রতিবিম্বিত হয়, আমি তাহা দেখি, আর গা উল্‌সে ওঠে।

যাঁর সঙ্গে বিবাহ হইবে (রামঃ রামঃ) তাঁকেও দেখিয়াছি—দাদাবাবুর কাছে আসিয়াছিলেন। প্রায় দাদার বয়সী, পরম-সুন্দর-দেহকান্তি, অল্পদিন হইল স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে এবং একটী শিশু পুত্র আছে। মন্দের ভাল, তখন আমার আহ্লাদ কত !! তিন দিন পরে বিবাহ—— আমায় পায় কে !!

তখন বৈশাখের প্রারম্ভ। সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার গিয়া পুকুর পাড়ে বসিলাম, সন্ধ্যার ফির্‌ফিরে বাতাস মাঝে মাঝে গায় লাগিয়া প্রাণে যেন মদিরা ঢালিতে লাগিল। সেই সময়ে মনের সেই অবস্থায়, সেই নিদাঘের সান্ধ্য-সমীরণ, আমার মত মানুষের কি সর্ব্বনাশ না করিতে পারে? মন যেন সেই বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া, নেশার ঘোরে, সেই বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে উড়িতে লাগিল। পাঁচীলের ধারের সুপারি গাছের পাতাগুলি সাঁই সাঁই, সর্‌ সর্‌ করিয়া হাত পা নাচাইয়া, আমায় যেন কত সুখের কথা বলিতে লাগিল। রজনী-গন্ধা ফুলগুলি দল বাঁধিয়া, লম্বা শীষের উপর চড়িয়া, দুলিয়া দুলিয়া, ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া, হাসিয়া হাসিয়া, আমায় যেন কত সুখের খেলাই দেখাইতে লাগিল; চোখের সামনে পুষ্করিণীর কালো জল, বাতাসের সঙ্গে গলাগলি করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া, আমার হৃদয় সরোবরে যেন কত সুখের তরঙ্গই উঠাইল। একটা কোকিল মেজদিদির বকুল গাছে বসিয়া রোজই ডাকিত, এতদিন তাহা কানেই উঠিত না। ছোট বেলা তাকে অনেক ভেঙ্‌চাইয়াছি, আজও সে সেই ডালটিতে বসিয়া তেমনি একঘেয়ে চীৎকার করিতেছে, কিন্তু আজ যেন সে কোথায় কি শিখিয়া আসিয়াছে! আজ যেন আমার প্রাণের বাঁশীর সহিত সে গলার সুর বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। আজ যেন তাহার প্রতি ঝঙ্কারে আমার তৃষিত মরমের গালে সহস্র সোহাগ-চুম্বন বাজিয়া উঠিতেছে! পৃথিবী সুখময়, সুখেরই জন্য —কে বলে হেথায় দুঃখ আছে? মিথ্যা কথা! —নহিলে এ সব কি? আমি কি?—সুখ, সুখের জন্যই আমি, (আত্মবিস্মৃত হইয়া) ভাবে বিভোরা হইলাম—সবই সুখ, দুঃখও! সুখ, সুখও সুখ, সবই সুখ—কেবলই সুখ !!—

——বটে?—চমক্‌ ভাঙ্গিল! পেছন দিক হইতে, আমার সুখের ছবি ফুঁড়িয়া চাপা হাসির ঝিলিক্‌ যেন কানে গেল! গায়ে ডোল্‌ দিয়া উঠিল, সর্ব্ব শরীর ভারহইয়া উঠিল, গায়ের রক্ত যেন জল হইয়া গেল—যেটুকু বাকি রহিল তাহা যেন সব গিয়া মুখে উঠিল, কান

ফাটিয়া কান দিয়া বাহির হইতে চাহিল। খুবই ভয়ে ভয়ে পেছন দিকে চাহিলাম। চক্ষে সর্ষিধার ফুল দেখিতে লাগিলাম; আর তা'র মধ্য দিয়া দেখিলাম,—স্বপ্নের মত দেখিলাম—গুটিচা'র পাঁচ যুবতী স্ত্রী-লোক, সব কয়টিই আমাদের পাড়ায়—আমার সহিত চখো চখি হইতেই হুট্ পাট্ করিয়া মেজদিদির বাটীর মধ্যে ঢুকিল; সঙ্গে বাল-বিধবা খুদী-ঠান্‌দিদি।

মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, দর দর করিয়া ঘাম ছুটিতে লাগিল; ত্রিভুবন আঁধার। মাথা আর উঁচু করিয়া রাখিতে পারিলাম না, দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিলাম, যেন সংজ্ঞা লোপ পাইতে চাহিল। কিছুক্ষণ নিজের অবস্থা ঠাওর করিতেই পারিলাম না;—কোথায় আমি? কে আমি? কি আমি? ব্যাপার কি?—

—গুরুতর! আপনার নাম ধরিয়া আপনি ডাকিলাম—"সরলা! কোথায় এখন তোমার সুখ-বাসরের সম্ভোগ-শয্যা? কোথায় তোমার সুখ স্বপনের রঙ্গ-রাজ্য? কোথায় তোমার বিলাস-কল্পনার নন্দন-কাননের স্বপ্ন-পারিজাত? বড় সুখের সাধ;—কেমন? কালামুখী! তোমার শাস্ত্রের বিচার, ন্যায়ের বিচার, সমাজ তত্ত্বগুলি এইবার একবার সাম্‌নে আনিয়া দেখাও দেখি? বড় পণ্ডিত হইয়াছ,—বড় সুখ চিনিয়াছ,—এখন?"—এখন আর কি? উঠিলাম, অন্ধকার প্রায় ঘনাইয়া আসি-য়াছে, কাল জলের উপর কাল ছায়া পড়িয়া আরও কাল হইয়াছে,—তারই দিকে—ধীরে—দৃঢ়পদে—অগ্রসর হইলাম। কিন্তু পায়ের কচি-পাতা খুমর দেওয়া মলের শব্দে মন চমকিল, থমকিয়া দাঁড়াই-লাম। এসব খুলিয়া, কাপড়ের পাড় ছিঁড়িয়া, তাই দিয়া বাঁধিয়া আগে জলে নিক্ষেপ করিব, তারপর——। আজ বিকালে বড় ভাবন করিয়া আলবার্ট-ফ্যাসান কাটিয়া চুল বাঁধিয়াছি, সর্বাঙ্গে গহনা পরিয়াছি, গোলাপী সিল্কের সেমিজের উপর কাল পাড়াপেড়ে ফিন্‌ফিনে ঢাকাই কোঁচাইয়া পরিয়াছি, দশ মিনিট ধরিয়া টার্কিশ্ তোয়ালে দিয়া মুখ ঘসিয়াছি;—আসিবার সময় মেজ-দিদির ঘরের বড় আয়নার সম্মুখে গিয়া একবার আপাদমস্তক আপনার রূপ দেখিয়া আপনি মজিয়া আসিয়াছি; আপনার গায়ে আপনি হাত বুলাইয়া, মনে মনে কত কি—কত কি ভাবিয়া, গা দোলাইতে দোলাইতে, বাগানে আসিয়া বসিয়াছি। এর প্রায়শ্চিত্ত তুষানল, এমন গ্রীষ্মের দিনে, অমন শীতল কাল জলের মধ্যে, আরাম করিয়া মরিলে আর কি হইল? কিন্তু উপস্থিত সুযোগের লোভ অসম্বরণীয়, কপালের কাঁচ-পোকার টিপটী খুঁটিয়া ফেলিয়া দিয়া, হাতের সোণার চুড়ী খুলিব বলিয়া টানিয়াছি—

—পেছন হইতে মেজদিদির গলার শব্দ হইল "সরলা"! দেখিতে দেখিতে তিনি একেবারে কাছে আসিয়া পড়িলেন। বড় রাগ হইল, সঙ্গে সঙ্গে—কি জানি

কেন—মনের দৃঢ়তাও যেন একটু কমিল, যেন কেমন হইয়া গেলাম, মেজদিদি বলিলেন "অন্ধকার হ'য়ে আসছে, এখনো জলের ধারে দাঁড়িয়ে কি ক'রছিস্—চল্ বাড়ী চল্"। কেমন বোকার মত বলিলাম "চল যাচ্ছি।" চলিলাম বাড়ী আসিলাম, কিছুই হইল না, কি করিলাম? —কি হইল?—কিছুই যে হইল না! এখন তবে উপায়?

ঘরে আসিয়া মেঝেয় বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিলাম, এক প্রকার স্থির করিলাম, গহনা কাপড় কিছুই খুলিলাম না, সবই যেমন তেমনি রহিল।

হিমীকে আস্তে আস্তে ডাকিলাম, ঘরের দরজা বন্ধ করিলাম। মেজদিদি গৃহ-কর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন, দাদাবাবু বাহিরে ছিলেন। হিমীর হাত ধরিলাম, কাঁদিয়া বলিলাম "হিমী! আমার মা নাই, তুই আমার মা, আজ আমার একটী উপকার করিতে হইবে,—আজীবন তোর কাছে ঋণী থাকিব, তোর পুণ্য হইবে।" আড়ম্বর দেখিয়া হিমী অবাক হইয়া আমার পানে চাহিয়া রহিল, তাকে আদ্যোপান্ত সব বুঝাইয়া বলিলাম। সে বুঝিল, আমার কথা তার ভাল লাগিল। সে গোয়ালার মেয়ে, নিজে বিধবা, কিন্তু "বিধবা বিবাহ" পড়ে নাই, বা দাদাবাবুর লেক্‌চারের মর্ম্মও বুঝে নাই। তার চৌদ্দ পুরুষ যাহা বুঝিয়া আসিয়াছে, সেও তাহাই বুঝিয়াছিল। আমার "বিবাহের" কথা শুনিয়া অবধি তার আক্কেল লোপ পাইয়াছিল,—তাই সে আজ আমার অবস্থা বুঝিল, আমার কথা তার ভাল লাগিল ও শেষে বলিল "এখন কি করিতে বল?" আমি বলিলাম "আজ রাত্রিতে লুকাইয়া বারটার মেলে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে, আমাকে শ্বশুরবাড়ী রাখিয়া তুই ফিরিয়া আসবি। তারপর আমি বুঝিব।"

সে বলিল "তারপর আমার দশা?" আমি বলিলাম "আমি তোর হাতে পত্র দিব,—তোর কোন ভয় নাই, কেহ কিছু বলিবেন না।" এ ছাড়া তাহাকে উপহার দিবার প্রস্তাবও করিলাম, তাহাতে সে জিব কাটিল। হিমী কিছুক্ষণ আপন মনে ভাবিয়া শেষে রাজি হইল। বাঁচিলাম, নির্ভাবনা হইলাম।

আহারান্তে আমার নির্দ্দিষ্ট ঘরে গিয়া শয়ন করিলাম, হিমী আমার ঘরেই শুইত। বাড়ীর সকলে নিদ্রিত হইলে দুজনে নিঃশব্দে বাড়ীর খিড়কির দরজা খুলিয়া বাগানে আসিয়া পড়িলাম। ইতোমধ্যেই গহনার সমস্ত খুলিয়া তোরঙ্গে রাখিয়া, আমার পুরাতন লাল কাপড় এক খানি বাহির করিয়া পরিধান করিয়াছি, বিছানার মোটা চাদর গায়ে দিয়া লইয়াছি, চুল খুলিয়া পূর্ব্বের মত করিয়াছি, পায়ের আলতা সাবান দিয়া উত্তম করিয়া ধুইয়া ফেলিয়াছি। অবশিষ্ট কএক খানি লাল কাপড় এবং দশটী মাত্র টাকা বাহির করিয়া সঙ্গে লইয়াছি।

অতি কষ্টে বাগানের ফটক খুলিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম, তখন একটু

একটু জোৎস্না উঠিয়াছে। ঝিয়ী ঝগ্‌ড়ু মেয়ে মানুষ, অনেক বার কত লোকের তত্ত্ব লইয়া কত জায়গায় রেলপথে যাওয়া আসা করিয়াছে, তথাপি সেই গভীর রাত্রিতে তার সঙ্গে যাইতে ভয় করিতে লাগিল, অনাথের নাথকে স্মরণ করিয়া চলিলাম। বাড়ী হইতে ষ্টেসন এক মাইল মাত্র।

যথাসময়ে, নিরাপদে, পরদিন প্রাতে আসিয়া শ্বশুর বাড়ী যাইবার ষ্টেসনে পৌঁছিলাম, তথা হইতে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া শ্বশুরালয়ে রওনা হইলাম।

(ক্রমশঃ)

সেখ-ফরিদ্।

সেখ-ফরিদ একজন বিখ্যাত মুসলমান পীর। তিনি সুফি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং লাহোরের অনতিদূরে বাস করিতেন। তাঁহার পন্থাবলম্বী ফকিরদিগকে সেখ্‌ ফরিদী ফকির কহে। তিনি নানকের সমসাময়িক ছিলেন। গুরু নানকের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল এবং উভয়ের মধ্যে যে সকল ধর্ম্মালোচনা হইয়াছিল তাহার অনেক অংশ নানক-পন্থী-ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রন্থ-সাহেবের মধ্যে এবং গুরু নানকের জীবনচরিত জন্মসাক্ষী পুস্তকের মধ্যে সন্নিবেশিত আছে।

সেখ-ফরিদের মাতা অতিশয় ধর্ম্মানু-রাগিণী নারী ছিলেন। মাতার গুণে যে অনেক পুত্রের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হয়, তাহার এই এক দৃষ্টান্ত। সেখ ফরিদের মাতা পুত্রকে বলিলেন, "বৎস! ফরিদ, সংসার করিয়া কি লাভ হইবে? তুমি সন্ন্যাসী হইয়া ভগবদ্‌-ভজন কর, ভগবানকে লাভ করিতে চেষ্টা কর; তাহা হইলে তুমি নিত্য সুখের অধিকারী হইবে। অনিত্য সুখের অভিলাষী তুমি হইও না। নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া তুমি সাধন ভজনে রত হও, কাহারও নিকট প্রার্থী হইও না।" সেখ-ফরিদ মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সংসার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বনে গমন করিলেন। সেখানে বন্য ফল, বৃক্ষের পত্র, মূল প্রভৃতি ভোজন করিয়া ভগবৎ-চিন্তায় রত থাকিতেন। কয়েক বৎসর এইরূপ সাধন-ভজনের পর একবার মাতৃ-চরণ দর্শনের অভিলাষে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। মাতার দর্শন পাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মাতা আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন "বৎস, কি আহার করিয়া এতদিন কাটাইলে?" ফরিদ বলিলেন, "বৃক্ষের পত্র, ফল এই সকল লইয়া আহার করিতাম"। মাতা কিছু না বলিয়া পুত্রের গাত্রে হাত বুলাইলেন এবং তৎপরে তাঁহার মস্তকের কেশ ধরিয়া সজোরে

টানিলেন। ফরিদ তাহাতে অত্যন্ত ব্যথা পাইয়া মাতাকে বলিলেন, "মস্তকে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে, আপনি এরূপ করিলেন কেন?" মাতা বলিলেন "বৎস, তুমি বৃক্ষের পত্র, ফল ছিঁড়িয়া খাইয়াছ; তোমার কেশ উৎপাটিত হয় নাই, তাহাতেই তুমি কত কষ্ট পাইলে, মনে কর বৃক্ষদের কত কষ্ট হইয়াছে। তুমি এখনও নির্ভরের ভাব শিখিতে পার নাই। পুনরায় তুমি বনে গিয়া সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হও।"

ফরিদ পুনরায় বনে গমন করিলেন এবং ভাবিলেন "কাহারো নিকট প্রার্থনা করাও নিষেধ এবং বৃক্ষদিগকে কষ্ট দেওয়াও নিষেধ। সুতরাং এক খণ্ড কাষ্ঠের টুকরা লইয়া রুটীর আকার করিয়া লইলেন এবং আপনার উদরের উপর তাহা রাখিয়া বায়ু সেবন করিয়া সাধন-ভজন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, বহুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে, পুনরায় তাঁহার মাতৃ-চরণ দর্শনের অভিলাষ হইল। তিনি পুনরায় মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, কি আহার করিয়া এতদিন কাটাইলে?" তিনি বলিলেন, "একখণ্ড কাষ্ঠ উদরে বাঁধিয়া রাখিয়াছি, অপর কিছু আহার করি না।" মাতা বলিলেন, "ইহাকে যথার্থ নির্ভর বলে না; তোমার এখনও সাবলম্বন-ভাব যায় নাই। একেবারে ভগবানের হস্তে নিজকে অর্পণ করিতে না পারিলে তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায় না। তুমি পুনরায় গিয়া সাধন ভজন কর।" ফরিদ পুনরায় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ভাবিলেন 'সম্পূর্ণ নির্ভরের ভাব না আসিলেত কিছুই হইবে না।' অনন্তর একখণ্ড শিকলের এক প্রান্তে আপনাকে বাঁধিয়া তাহার অপর প্রান্তে একখানি কাষ্ঠ-খণ্ড সংলগ্ন করিয়া আপনাকে একটা কূপ মধ্যে ঝুলাইলেন এবং অধোমুখে নত হইয়া ভগবানকে প্রাণ মন সমর্পণ করিলেন। কিছুদিন এইরূপে অতিবাহিত হইলে এক মেষ-পালক জলপানের অভিলাষে কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন। জল সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত কূপের নিকট গিয়া ফরিদকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এরূপ ভাবে আপনাকে কূপ-মধ্যে ঝুলাইয়া রাখিয়াছ কেন?" ফরিদ বলিলেন, "ভগবানকে লাভ করিবার জন্য।" মেষ-পালক জিজ্ঞাসা করিল, "এইরূপ করিলে ভগবানকে পাওয়া যায়?" ফরিদ উত্তর করিলেন, "হাঁ—পাওয়া যায়।" মেষপালক তাহা শুনিয়া মেষ সকলকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কিছু তৃণ সংগ্রহ করিয়া তাহার দ্বারা একখণ্ড দড়ি পাকাইলেন এবং সেই দড়িতে নিজেকে বাঁধিয়া সেই কূপ-মধ্যে ঝুলাইলেন এবং পাছে সাধুর উপরে থাকিলে তাঁহাকে অপমান করা হয়, এই ভাবিয়া ফরিদ অপেক্ষা আরও নিম্নভাগে ঝুলিয়া রহিলেন। তাঁহারা উভয়ে এইরূপ ভাবে ঝুলিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহাদের উভয়ের অবস্থা দেখিয়া

ভগবান ভাবিলেন, "ফরিদের ত লোহার শিকল রহিয়াছে, শীঘ্র ছিঁড়িবেনা, কিন্তু এই মেষ-পালকের দড়ি এখনই ছিঁড়িয়া যাইবে এবং আমার আশায় সাধন করিতে গিয়া এখনই পতিত হইয়া নষ্ট হইবে। সুতরাং আর বিলম্ব করা হয় না, ইহাদিগকে কৃপা বিতরণ করি। ভগবান কৃপা করিলেন, ফরিদ ও মেষ-পালককে দর্শন দিলেন। মেষ-পালক দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইল, কিন্তু ফরিদের বিশ্বাস হইল না। ফরিদ বলিলেন, "আমি কিরূপে জানিব যে আপনি ভগবান।" ভগবান বলিলেন, "সন্দেহ হইয়া থাকে ত আমাকে পরীক্ষা কর।" ফরিদ বলিলেন, "এই যে পক্ষীটা কূপের প্রান্তে বসিয়া রহিয়াছে, ইহা যদি এখনি মরিয়া যায় তবে জানিব আপনি ভগবান।" পাখীটা মরিয়া গেল। ফরিদ বলিলেন, "আবার যদি ইহাকে জীবিত করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি বিশ্বাস করিতে পারি।" পক্ষীটা পুনরায় জীবিত হইল। ফরিদের তখন বিশ্বাস জন্মিল। ভগবান তখন ফরিদ ও মেষ-পালককে কৃপা করিলেন। কিন্তু ফরিদকে যে অবস্থা দিলেন, মেষপালককে তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর অবস্থা প্রদান করিলেন এবং উভয়কে কূপ হইতে উত্তোলন করাইলেন। মেষপালক ভগবদ্দর্শনে আত্মহারা হইয়া সমাধি-অবস্থায় অরণ্যে রহিলেন, কিন্তু সেখ ফরিদ ভগবদ্ভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া ভগবন্নামে কীর্ত্তন করিতে করিতে দেশ-ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ফরিদ তপস্যা-বলে শক্তিমান হইয়া নানা-দেশ ভ্রমণ করিলেন। এক দিবস তিনি পিপাসার্ত্ত হইয়া একটী কূপের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক সেই কূপ হইতে জল উত্তোলন করিতেছেন ও পুনরায় তাহা কূপ-প্রান্তে নিক্ষেপ করিতেছেন। তিনি সেই স্ত্রীলোকের নিকট জল প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু স্ত্রীলোকটী তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া পূর্ব্ববৎ জল উত্তোলন ও নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ফরিদ একবার বলিলেন, দুইবার বলিলেন, তিনবার বলিলেন, কিন্তু স্ত্রীলোকটী তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। অবশেষে ফরিদ রুষ্ট হইয়া স্ত্রীলোকটীকে বলিলেন, "জান, আমি তোমাকে এখনই শাপ দিয়া মারিয়া ফেলিতে পারি?" তখন স্ত্রীলোকটী বলিলেন, "যাও যাও, একটী পাখী পাও নাই যে, ভগবানকে বলিয়া মারিয়া ফেলিবে।" ফরিদ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ বিষয় কেমন করিয়া জানিলে? তুমি কে? কেনই বা এরূপ ভাবে জল উত্তোলন করিয়া নিক্ষেপ করিতেছ?" স্ত্রীলোকটী বলিলেন, "আমার ভগ্নীর গৃহে আগুন লাগিয়াছে, সে আমায় স্মরণ করায় আমি এখান হইতে জল দিয়া সে অগ্নি নির্ব্বাণ করিলাম।" ফরিদ সবিস্ময়ে বলিলেন,

"এখান হইতে আপনি অপর দেশের অগ্নি নির্ব্বাণ করিলেন, এত শক্তি আপনার!! আমার পাখী মারিয়া ভগবানকে পরীক্ষা করার বিষয়ই বা আপনি কি শক্তিতে জানিলেন? এ শক্তি আপনি কি-প্রকারে লাভ করিলেন?"

স্ত্রীলোক উত্তর করিলেন, "কিরূপে যে আমি এই শক্তি পাইলাম, তাহা আমিও জানি না; সকলই ভগবানের কৃপা। তবে এইমাত্র আমি আপনাকে বলিতেছি যে, আমার স্বামী রাত্রিতে শয়নকালে দুগ্ধ পান করিতেন এবং আমি প্রতিদিন দুগ্ধ-পাত্র লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতাম। এক দিবস আমি দুগ্ধ লইয়া গিয়া দেখিলাম আমার স্বামী নিদ্রিত হইয়াছেন। তাঁহার সেই সুখের নিদ্রা ভঙ্গ করিতে আমার ইচ্ছা হইল না। নীরবে তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, নিদ্রা-ভঙ্গ হইলেই দুগ্ধ পান করাইব। আমি দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা-ভঙ্গ হইল না, এইরূপে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। অনন্তর রাত্রি-শেষে যখন পক্ষিগণ ভগবানের নাম গান করিতে লাগিল, তখন আমার স্বামীর নিদ্রা-ভঙ্গ হইল; তিনি জাগিয়াই আমার দিকে প্রফুল্ল দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন, "রাম কহ, রাম কহ।" আমি যে সমস্ত রাত্রি স্বামীর চিন্তায় রত ছিলাম, তাঁহাকে দেবতা-জ্ঞানে তাঁহারই সেবাভিলাষিণী হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম, সেই তপস্যা-গুণে শুদ্ধ চিত্ত লাভ করার পর, যখন আমার স্বামী বলিলেন, "রাম কহ, রাম কহ," অমনি আমি চারিদিক রামময় দেখিলাম, আমার অন্তরে বাহিরে তখন ভগবান পূর্ণরূপে বিরাজমান হইয়া আমাকে দর্শন দিলেন। সেই হইতে আমি এই শক্তি লাভ করিয়াছি।"

ফরিদ সেই সাধ্বী এবং ভগবৎ-কৃপা-প্রাপ্তা রমণীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন; তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি তাঁহাকে বার বার প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সেই স্ত্রীলোকটী বলিলেন, "ফরিদ, তুমি অতি সাধু পুরুষ, ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াও, তাঁহারই মহিমা প্রচার কর। তোমার কোন অপরাধ হয় নাই।"

এক সময়ে গুরু নানকের সহিত সেখ ফরিদের সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। সেখ ফরিদ তখন আশা-দেশের এক জঙ্গলে তপস্যা করিতেন। গুরু নানক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার অভিপ্রায়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখ ফরিদ গুরু নানককে দেখিবা-মাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আল্লা, আল্লা, হে দরবেশ!" নানক বলিলেন—"আল্লাই আমার উদ্দেশ্য, হে ফরিদ, এস, আল্লাই আমার উদ্দেশ্য।" নানকের হাত ধরিয়া ফরিদ বসাইয়া বলিলেন—"সংসারের সুখ চাও, অথবা আল্লাকে চাও; দুই নৌকায় পা দিওনা, তাহা হইলে

তোমার মাল নিশ্চয়ই ডুবিয়া যাইতে পারে।”

নানক বলিলেন—“তুমি দুই নৌকাতে পা দাও, দুই নৌকাতে তোমার মাল বোঝাই কর। একটী নৌকা ডুবিলেও অপরটীতে পার হইতে পারিবে। এই নামরূপ মাল জল বা নৌকার অপেক্ষা করে না, ইহা জলে ডোবে না বা নষ্ট হয় না, এই মালই প্রকৃত সম্পদ, ইহা সেই পরমাত্মাতে অবস্থিত।”

ফরিদ বলিলেন—“এই সংসাররূপ পিশাচীর সহিত কে ভালবাসা স্থাপন করিবে? হে নানক, ইহার দৃষ্টি-মাত্রেই উর্ব্বরা ক্ষেত্র মরু-সদৃশ হয়।”

নানক বলিলেন—“সংসারের প্রতি ভালবাসা স্বভাবতঃই আসে। যদি ক্ষেত্রোস্বামী মনযোগী থাকেন,তাহা হইলে ক্ষেত্র নষ্ট হয় না।”

ফরিদ বলিলেন—“শরীরের বল গিয়াছে, হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখন আমার প্রিয়তম আমার বৈদ্য হইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন।”

নানক বলিলেন—“আপনার শরীরের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুকে লক্ষ্য কর। কথায় বলা অজ্ঞানতা, হৃদয়ে অনুভব কর। সেই বন্ধু দূরে নহেন, আপনারই মধ্যে রহিয়াছেন।”

ফরিদ এবং নানক এক রাত্রি সেই বনে এক সঙ্গে বাস করিলেন।

ফরিদ বলিলেন—“রাত্রিতে যে সকল সাধক, জাগরিত থাকিয়া তাঁহার নাম করেন, তাঁহারা প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হয়েন। প্রথম রাত্রিতে পুষ্প, শেষ রাত্রিতে ফল ভোগ হয়।”

নানক বলিলেন—“প্রভু নিজেই কৃপা করেন, তাঁহাকে শুধু সাধন করিয়া কেহ পাইতে পারেনা। কত ব্যক্তি জাগিয়া থাকিয়াও তাঁহাকে পায় না; আবার কেহ কেহ ঘুমাইয়া থাকিলেও তিনি তাহাকে জাগাইয়া দর্শন দিয়া যান।”

পরদিন প্রাতে এক ব্যক্তি ফরিদ ও নানককে সেখানে দেখিয়া তাঁহাদের সেবার নিমিত্ত একটী পাত্রে দুগ্ধ এবং তাহার মধ্যে চারি খানি মোহর দিয়া লইয়া আসিল। ফরিদ দুগ্ধের কতক অংশ ঢালিয়া লইয়া অবশিষ্ট অংশ নানকের জন্য রাখিলেন। নানক বলিলেন, “ফরিদ, দুগ্ধের মধ্যে হাত দিয়া দেখ কি আছে।” ফরিদ দেখিলেন তাহার মধ্যে মোহর রহিয়াছে; দেখিবা-মাত্র সমস্ত ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন।

অতঃপর উভয়ে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলে যে ব্যক্তি তাঁহাদিগের জন্য দুগ্ধ ও মোহর যে পাত্রে আনিয়াছিল, সেই পাত্রটী উঠাইতে গিয়া দেখিল পাত্র সোণা হইয়া গিয়াছে এবং তাহা মোহরে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সে তাহা লইয়া গেল, কিন্তু মনে মনে এই আক্ষেপ করিতে লাগিল, যদি আমি স্বর্ণ দিতাম তাহা হইলে স্বর্ণ প্রতিদান পাইতাম; আমি হতভাগা তাই এই ফকীরদিগের জন্য স্বর্ণ আনিয়াছিলাম।”

ফরিদ ও নানক অতঃপর আশা দেশের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। সে দেশের লোক সকলেই সত্যবাদী। এই সত্যের প্রতাপে তাহারা দিবসে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিত এবং রাত্রিতে শস্য সংগ্রহ করিত। তাহাদের রাজা এক সময়ে কোন মিথ্যা কথা বলায় তাহার মৃতদেহের সমস্ত অংশ দগ্ধ হইয়া কেবল মস্তক দগ্ধ হইতে ছিল না। অবশেষে জানা গেল মিথ্যা কথা বলার জন্য এইরূপ হইয়াছে যখন ঐ মস্তকে কোন সাধুর পদস্পর্শ হইবে তখন তাহা দগ্ধ হইবে। নগরবাসী সকলে সেই জন্য সাধুর অপেক্ষা করিতেছিল। সাধু উপস্থিত হইলে জানিতে পারা যাইবে এজন্য নগরের সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া কেবল মাত্র একটী দ্বার খুলিয়া রাখা হইয়াছিল। এমন সময়ে ফরিদ ও নানক তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া নগরবাসিগণ শবের মস্তকে পদ রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নানক ফরিদকে বলিলেন "ফরিদ তুমি তোমার পদ দ্বারা শবের মস্তক স্পর্শ কর। ফরিদ বলিলেন, আমার কি গুণ আছে যে আমি এই কার্য্য করিব? আপনিই ইহাকে উদ্ধার করুন।" গুরু নানক শবের মস্তকে পদ রক্ষা করিলেন, তাঁহার পদস্পর্শ মাত্র শবের মস্তক ভস্মীভূত হইয়া গেল।

সেই নগরবাসিগণ তখন নানক ও ফরিদের পদে পতিত হইলেন ও ভক্তি সহকারে তাঁহাদের যথেষ্ট সৎকার করিলেন। নগরবাসিগন রুটী আনিয়া তাঁহাদিগকে আহার করিতে বলিলেন। ফরিদ বলিলেন, আমি আহার করিয়াছি। তাহাতে এক জন নগরবাসী বলিলেন "তুমি কি সেখ ফরিদের দেশের লোক, সে খানে ফরিদ মিথ্যা ভান করিয়া পেটে কাঠের রুটি বাঁধিয়া রাখিত?" ফরিদ শুনিয়া অবাক হইলেন, বুঝিলেন সত্যের আদরে সেই নগরবাসীগণ কত উন্নত ও কি প্রকার শক্তি লাভ করিয়াছে। তাঁহার অহংকার চূর্ণ হইল। তিনি আপনাকে নিজ সাধন গুণে শক্তিশালী মনে করিতেন; কিন্তু যখন দেখিলেন আশা নগরের প্রত্যেক ব্যক্তিই শক্তিশালী ও সত্যনিষ্ঠ, তখন তিনি বুঝিলেন যে ভগবানের কৃপাতেই মানুষ সব লাভ করিতে পারে, অহংকার করিবার কিছু নাই।

নানক বলিলেন, ফরিদ তুমিই প্রকৃত সাধু। তোমার মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে। তুমি গুরুকরণ কর, পীরের আশ্রয় গ্রহণ কর।" ফরিদ বলিলেন, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, এই বলিয়া পুনরায় বনে প্রবেশ করিলেন।

সেখ ফরিদ সিদ্ধ অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম মুসলমানদিগের মধ্যে বিখ্যাত।

সেখ ফরিদী পন্থার অনেক ফকীর মুসলমানদিগের মধ্যে আছেন।

গ্রন্থ সাহেব হইতে ফরিদের দুইটী শ্লোক নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কবল সুঅক্ষর কবল গুণ, কবল সুমণিয়া মন্ত্র।
কবণ সুবেশো হো করি চিতু বশিয়া বৈং- কতু॥

সেই সুঅক্ষর কি, সেই গুণ কি সেই রত্ন মন্ত্র কি, সেই বেশই বা কি, যাহা দ্বারা বিভূষিত হইলে সেই প্রিয়তমকে পাওয়া যায়?
নিবণু সুঅক্ষর, খবণ গুণ, জিহবা মণিয়া মন্ত্র।
ইয়েতৈ ভৈণে যে শুকরি তা বশিয়া বীকন্তু॥

বিনয়ই সেই সুঅক্ষর, ধৈর্য্যই সেই গুণ, জিহ্বাই সেই রত্ন যাহা দ্বারা মন্ত্র উচ্চারিত হয়।

হে ভগিনী, এই তিন দ্বারা তুমি সুশোভিত হইলেই সেই প্রিয়তম তোমার বশে আসিবেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন দত্ত।

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী। তাঁহার লিখিত ডায়েরী হইতে।

১। ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে গেলে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়—এই জন্ত লোকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে চায় না। অনেক লোকে ধর্ম্মের পথে চলিতে চলিতে এক একটী ত্যাগের স্থানে স্থগিত হইয়া দাঁড়ান ও ফিরিবার পথ দেখেন।

২। সংসারে কি মানুষের ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না—মানুষ ধনের আশায়, মানের আশায়, সুখের আশায় কত ত্যাগ স্বীকার করে। সেইগুলি রক্ষা করিতে কত কষ্ট পায়। অবশেষে সেগুলি রক্ষা হয়। কতক আপনার নির্ব্বোধতাতে কতক দস্যু তস্কর ও হিংস্র লোকের অত্যাচারে যায়, অবশিষ্ট যা থাকে, তাহা মৃত্যুকে দিয়া যাইতেই হয়। পৃথিবীর হাটে বিনিময় এইরূপ।

৩। ধর্ম্মের জন্য কষ্ট স্বীকারে অক্ষয় ধন লাভ হয়, যে ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহা নশ্বর। ঈশ্বরের কাছে বিনিময় কেবল লাভের।

৪। ধর্ম্মের জন্ত লোকে ভ্রান্ত হইয়া অনেক বৃথা কষ্ট করেন, অনর্থক ত্যাগ স্বীকার করেন। সন্ন্যাসী বৈরাগীরা ইহার দৃষ্টান্ত, ইহা ধর্ম্মের আদেশ নহে।

৫। ধর্ম্মের জন্ত সর্ব্ব প্রধান ত্যাগ স্বার্থ ত্যাগ। আমার যাহা কিছু—আমার জন্ত নয়,—কিন্তু মালিকের জন্ত। তাঁর দেওয়া ধন অকাতরে তাঁকে দিব, আপনার নির্ব্বোধতায়, তস্কর, দস্যু, মৃত্যুর

অত্যাচারে যাহা হারাইতে হয়, তাহা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁকে দেওয়া প্রশস্ত।

৬। এই দেওয়া প্রেম হইতে হইলেই স্বাভাবিক ও সহজ হয়। প্রেমের আশ্চর্য্য-শক্তি সংসারে দেখিতে পাই। মাতা পুত্রের, স্ত্রী স্বামীর, বন্ধু বন্ধুর জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করেন আর তাহাতে আনন্দিত হন ও আপনাকে ধন্য মনে করেন।

৭। অন্তরে ঈশ্বর প্রেম হইলে তাঁহার জন্য অদেয় কি থাকে? এতো তাঁর দেওয়া ধন, তাতে তাঁর কার্য্যের জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণে কি দুঃখ?

৮। প্রেমিক ব্যক্তি তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকেন। তাঁর জন্য সবই অকাতরে দেন, দিয়া আনন্দ লাভ করেন। প্রেমেতে লোককে ত্যাগী করায়, সেই ত্যাগেই ভোগ। ভোগীর ভোগ স্বার্থপূর্ণ তাহা কুকুরের উচ্ছিষ্ট—ঈশ্বর প্রেমিকের ত্যাগই ভোগ। বিশ্বপ্রাণে যাঁর আত্ম ক্ষুদ্র প্রাণ সমর্পিত—বিশ্বপ্রেমে যাঁর আত্মপ্রেম বিসর্জ্জিত তিনি সেই আনন্দময়ের সহিত কামনায় বিষয় সকল উপভোগ করেন।

বারাণসী-তত্ত্ব।

সেবের মোরব্বা এক টাকায় এক সের পাওয়া যায়। উহা প্রস্তুত করিতে হইলে ৬টা সেব এবং অর্দ্ধ সের উত্তম খাঁড় (চিনির) আবশ্যক। ৬টা সেবের দাম ছয় আনা এবং অর্দ্ধসের চিনির দাম তিন আনা, লেবু দুই পয়সা, কেওড়া এক পয়সা ও জ্বালানি কাষ্ঠ এক আনা। সর্ব্ব শুদ্ধ এক সের মোরব্বার খরচ দশ আনা নয় পাই কিন্তু বিক্রয় কালে ইহা টাকায় এক সের দরে বিক্রয় হইবে।

আমলকির মোরব্বা সস্তা দরে পাওয়া যায়। ইহা আট আনায় এক সের। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে অর্দ্ধ সের চিনির আবশ্যক। ইহার দাম আড়াই আনা। তাজা আমলকি অর্দ্ধ সেরের দাম দুই পয়সা। কেওড়ার ভাগ আমলকিতে অধিক দিতে হয় কারণ আমলকি কষায় সুতরাং এক পয়সা স্থানে দুই পয়সা খরচ করিলেই যথেষ্ট। জ্বালানি কাষ্ঠ এক আনা। একুনে সাড়ে চারি আনা খরচ কিন্তু বিক্রয় হইবে আট আনায়।

আচার ছয় আনা ও আট আনায় সের পাওয়া যায়। আমের আচার খাইতে সুস্বাদু। দেশী লোকে আমের আচার-কেই আদরের চক্ষুতে দেখে। ইহা প্রস্তুত করিবার উপাদান যথা :—

সির্কা ৩ পোয়া	১ পয়সা।
আম (শুষ্ক) ২ ছটাক	১ "
চিনি ঐ	১ "
লঙ্কা ১ ছটাক	১ "

কলোঞ্জি (কেলে জিরে)	১ "
আদা	১ "
পুদিনা	১ "
লবণ	১½ "
অন্যান্য ক্ষুদ্র ফল	১ আনা

মোট ৩ আনা ১½ পয়সা।

উপরোক্ত তালিকাটি ১ সের আচার প্রস্তুতের জন্য। কিন্তু ইহা বিক্রয় হইবে ছয় আনায়।

আচার ও মোরব্বার ক্রেতা খুবই কম। সেই জন্যই বোধ হয় কিছু চড়া দামে বিক্রয় হইয়া থাকে। কারণ বিক্রয় না হইলে আচার বিক্রেতার ক্ষতি। অতএব ক্ষতি পূরণ করিবার জন্যই তাহারা চড়া দরে বিক্রয় করে।

হিন্দু ও মুসলমান জাতি নির্বিশেষে সকলেই পান ব্যবহার করিয়া থাকে। পান ছয় প্রকারের যথা কর্পূর, মাকর, বাঙ্গালা, কোম্মী, দেশাওয়ারী এবং কল্‌কাত্তয়া। কর্পুরী পানের দুই ঢুলির দাম সাড়ে দশ আনা। পান তৈয়ার করিয়া দিলে তাহাকে "গিলৌরী" কহে। "গিলৌরীর" উপাদান খয়ের, চুণ, সুপারী এবং এলাচ। একটা গিলৌরী তৈয়ার করিতে হইলে দেড়টা পানের আবশ্যক। তিন শত গিলৌরী তৈয়ার করিলে পান বিক্রেতার তিন আনা লাভ হইয়া থাকে। শ্বেত বর্ণের পানের আদর অধিক। সুতরাং খুব চড়া দামে বিক্রয় হইয়া থাকে।

সুপারী বিক্রেতা অবশ্য তাম্বোলী (বারুই জাত) নহে। যে সে জাতিতে গুবাক বিক্রয় করিয়া থাকে। সুপারী দুই প্রকারের যথা —(১) চিক্‌নি ডালি এবং (২) নিম চিকনি। পূর্ব্বোক্তটী অমরাবতী হইতে এবং দ্বিতীয়টী বোম্বাই হইতে আইসে। চিক্‌নি ডালির মণকরা দর ৩৪ টাকা হইতে ৪২ টাকা এবং নিম চিকনির ২৫ টাকা হইতে ২৮ টাকা পর্য্যন্ত। যাহারা চিকনি ডালী তৈয়ার করে তাহারা মারওয়াড়ীদিগের নিকট হইতে খোলে ক্রয় করে এবং সুপারী গুলিকে কাটিয়া ফুটকরা দরে বিক্রয় করে। সুপারীর দুইদিক হইতে কথঞ্চিৎ কাটিয়া ফেলা হয়। তৎপরে সুপারিটার দুই দিক গর্ত্ত করা হয়। পরে ধারগুলি কাটিয়া ফেলা হয়। এই সুপারিকে "দোরুখি" বলে। কর্ত্তিত টুকরা গুলি "চুরা" নামে খ্যাত। মারওয়াড়ীগণ এক মণ ৪০ সের বিক্রয় করে। যদি দশ সের সুপারি ৩৪ টাকার মণ দরে ক্রয় করা হয় তাহা হইলে ৮ টাকা ৪ আনায় ১২ লম্বরী সের পাওয়া যায়। এক সের চিক্‌নি ডালি এক দিনে এবং এক জনের পরিশ্রমে তৈয়ার হইতে পারে। সুতরাং তজ্জন্য ১ টাকা ১৪ আনা আরও যোগ করা উচিত চিক্‌নি ডালীওয়ালার লাভ প্রত্যেক সেরে প্রায় ১০ আনা হইয়া থাকে। সুপারীর মধ্যে নিম চিকনি অধম বলিয়া গণ্য সুতরাং তাহার লাভ সের প্রতি সাড়ে পাঁচ আনা।

(ক্রমশঃ)

শিল্প শিক্ষা।

পাঠিকা ভগিনীগণ আজ আপনাদের জন্য একটী ক্ষুদ্র ফ্রকের কাট লইয়া আনিয়াছি। পূজা আসিতেছে প্রত্যেক ঘরে ঘরে এখন সন্তান, সন্ততি, আত্মীয় স্বজনের জন্য নূতন বসন ভূষণের ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে। যাঁহার যেরূপ অবস্থা তিনি তদনুযায়ী আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত এবং পরিজনগণও তাহাই পাইয়া সন্তুষ্ট। এই আনন্দের দিনে স্বহস্তে প্রস্তুত বসনে সন্তান ও প্রিয়জনকে সজ্জিত করিতে পারিলে এই আনন্দ আরও শতগুণ বর্দ্ধিত হয়। এই পূজার আনন্দ সর্ব্বাপেক্ষা শিশু দিগেরই অধিক, কারণ তাহারা আর কিছুই জানে না কেবল খাইতে ও নূতন বসন ভূষণে সজ্জিত হইতে পারিলেই আনন্দে আটখানা। শিশুদের এই আনন্দ দেখিয়া পিতা মাতা আত্মীয়গণও সকল দুঃখ কষ্ট বিস্মৃত হন।

আজ তাই শিশুদের উপযোগী জিনিষই ভগিনীদিগের জন্য আনিয়াছি। এই ফ্রকটীর বাঙ্গালা নাম কি তাহা আমি জানি না, কারণ ইহা এদেশের আমদানী নহে বিদেশ হইতে আমদানী। ইংরাজীতে ইহাকে "poplu frock" বলে। ইহার কাট খুবই সহজ সেলাইও বেশী নয়, এক কথায় ইহা খুব শীঘ্র তৈয়ার হইয়া যায়, দেখিতেও বেশ সুন্দর। এই ফ্রক একটু মোটা কাপড়ে তৈয়ার করিতে হয়। কারণ তলায় যে ঘের দেওয়া হয় সেই ঘেরটী কুচাইয়া দিবার পরিবর্ত্তে পাটে পাটে দিতে হয়, সেই জন্য পাতলা কাপড়ে সুবিধা হয় না। আর একটা কারণ মোটা কাপড়ে করিলে কাপড়ও কম লাগে।

নিম্নে ইহার প্রস্তুত প্রণালী প্রদত্ত হইল।

কাট—প্রথমতঃ একখানি কাপড় পাট করিয়া লইয়া এই নমুনার কাটটী দেখুন। ইহাতে যেরূপ আছে সেইরূপে বুক পিট এক সঙ্গে কাটিয়া লউন (ইহার কাঁধের উপর সেলাই পড়িবে না, হাতও স্বতন্ত্র কাটিতে হইবে না)।

হাত, বুক ও পিঠ এক সঙ্গেই কাটা হইয়া যাইবে। তৎপরে নিম্নের ঘের একখণ্ড কাপড় কাটিয়া লইয়া শেষে গলার কলারটী কাগজের নমুনা দেখিয়া কাটিয়া লউন (এই নমুনাটী ফ্রকের অর্দ্ধেকের কাট। আধখানা বুক, পিঠ, গলা, কলার ও তলার ঘেরটী চার ভাগের এক ভাগ।)

সেলাই—

উপরের অংশের দুই ধার সেলাই করিয়া, (১ চিহ্নিত স্থান) ঘের সেলাই করুন, (২ চিহ্নিত স্থান) ঘেরের তলায় চওড়া করিয়া মুড়িয়া সেলাই দিয়া হাতের মুখ সেলাই করুন, হাতের মুখে রুচি

অনুযায়ী পাড় ফিতা বা অন্য কিছু দিতে পারা যায়। তৎপরে (৩ চিহ্নিত স্থান) গলা ও কলারে ৪, ৫, ৬, চিহ্নিত স্থান সেলাই করুন। গলার সম্মুখ দিক (৩ চিহ্নিত) অন্য এক টুকরা কাপড় দিয়া খুব সরু করিয়া সেলাই করিয়া লউন। গলার কলারে ও হাতের ন্যায় পাড় কিম্বা অন্য কিছু বসাইয়া লইলেই একটী অতি সুন্দর ফ্রক তৈয়ার হইবে। কোমরে একটী ঐ কাপড়ের কোমর বন্ধ দিবেন। ইহার বোতাম সম্মুখ দিকে থাকিবে।

সংবাদ।

১। লর্ড কারমাইকেল মহোদয় নবদ্বীপ গমন করিলে তথাকার পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহাকে "নীতিরঞ্জন" উপাধী প্রদান করেন। লর্ড কারমাইকেল মহোদয় এই সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"সমবেত নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত মহাশয়গণ! আপনাদের সাদর অভিনন্দনে পরম প্রীতিলাভ করিলাম, প্রতিদানস্বরূপ আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। বহুদিন হইতে বঙ্গদেশের সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তারের কেন্দ্রস্থল দর্শন করিবার বাসনা ছিল, আজ তাহা ফলবতী হইল। পণ্ডিতগণের এই পবিত্র ও রমণীয় আবাস ভূমিতে উপস্থিত হইয়া এবং তাঁহাদের সহিত সদালাপ করিয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করিলাম। টোল কেবল সংস্কৃত অধ্যাপনার স্থল নহে অল্পভোগ ও উচ্চচিন্তা, সংযম, ধৈর্য্য পবিত্রতা এবং অপরাপর সদগুণের শিক্ষামন্দির বলিয়া আদরণীয়। আজ সেই টোল পরিদর্শন করিয়া আমি ধন্য হইলাম। বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ আয়ত্ব না থাকায় আপনাদের যথোচিত সম্ভাষণ করিতে অক্ষম হইলাম ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।"

২। বরোদার মহারাণীমহোদয়া দিল্লীর মহিলা কলেজে ২৫ হাজার টাকা ও বরোদার চিমন বাই হাই স্কুলে ৬ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আরও শুনা যাইতেছে যে হিন্দু মহিলাদিগের শিক্ষার জন্য বৃত্তি স্থাপন কল্পে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এতৎসঙ্গে দান করিয়াছেন।

৩। মহীশূর রাজ্যে এক দেশলাইয়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই কারখানার স্থায়ীকরণার্থ রাজ সরকার হইতে অর্থ সাহায্য করা হইবে।

৪। ইংলণ্ড প্রবাসী ১৮০ জন ভারতীয় ছাত্র কেহ আহত সৈনিকদের হাসপাতালে, কেহবা হাসপাতাল জাহাজে ডাক্তার, ড্রেসার, অনুবাদক প্রভৃতি নানা কার্য্য করিতেছেন। যাঁহারা ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহাদের ৪ জন ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন। ৩ জন ফ্রান্সে দোভাষীর কর্ম্ম করিতেছেন। ব্যারিষ্টার মিঃ পি, এল, রায়ের পুত্র মিঃ পরেশলাল রায় গোলন্দাজ সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। তিনি অনেক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। এঞ্জিনিয়ারিং বি, এস সি উপাধীধারী মিঃ রামলিঙ্গম রয়াল ফিউজিলিয়ার্স সৈন্যদলভুক্ত হইয়াছেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ পদমজী বিজলসেক্সস সৈন্যদলে সামান্য পদাতিক সেনার কর্ম্ম করিতেছেন। অন্যান্য ভারতবাসীদের কেহ টেরিটোরিয়ল কেহবা লর্ড কিচেনারের নূতন সৈন্যদলে যোগদান করিয়াছেন।

৫। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিদ্যাপতি ও "চণ্ডীদাস" ইংরাজীতে অনুবাদ করিতেছেন এইরূপ শুনা যাইতেছে। কতক গুলি বাউল সঙ্গীত ও ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন।

মুষ্টিযোগ।

মুখক্ষত রোগে—প্রত্যহ ক্ষেৎপাপড়ার রস অর্দ্ধ ছটাক মধুর সহিত খাইলে সকল প্রকার মুখরোগ আরোগ্য হয়।

২। গরল আরোগ্যের উপায়—কাঁচা হলুদ দুধে বেটে গায়ে মাখিলে গরল আরোগ্য হয়।

৩। মাকড়সার গরল—দাড়িমের শেকড় ও গোল মরিচ একত্রে শ্বেত চন্দনের সহিত বাটিয়া ঘায়ে লাগাইলে ঘা শুকাইয়া যায়।

কাঁচ কলার আঁটা দিনে ২।৩ বার লাগাইলে উপকার হয়।

৪। আফিমের নেশা কমাইবার উপায়—আতার পাতা বাটিয়া খাওয়াইলে আফিমের নেশা কমিয়া যায়। অতি শিশুকে দেশীয় কাগজের টুকরা ভিজাইয়া খাওয়াইলে নেশা কমিয়া যাইবে।

৫। গলার স্বর পরিষ্কার করিবার উপায়—প্রত্যহ ঘিয়ে গোলমরীচ ভাজিয়া গরম থাকিতে খাইলে গলার স্বর পরিষ্কার হয়, ইহাতে দেহ বলিষ্ঠ হয়।

৬। কুইনাইনের দোষ নিবারণের উপায়—চিরেতার জলে চিনি মিশাইয়া খাইলে কুইনাইনের দোষ নিবারণ হয়।

৭। সুবাসিত নারিকেল তৈল—

লচি　২ ড্রাম।

এলকালিন রুট ২ ড্রাম।

গোলাপের পাতা ১ আউন্স।

অয়েল স্যান্থাল ফ্ল্যাভা ১ আউন্স।

ক্যাষ্টর অয়েল ১ আউন্স।

অটোডি রোজ ১২ ফোঁটা।

নারিকেল তৈল ১ বোতল।

৮। মুখের জারি ঘা—শিশুদের মুখে ঘা হইলে ভেড়ার দুগ্ধ দুই বা চারি ফোঁটা

২।৪ বার লাগাইলে মুখের, জিহ্বার ও ঠোঁটের ঘা আরাম হয়।

৯। চুলির ঔষধ খুব পুরাতন মুলার বীচি এক ছটাক, ও দুই তিন দিনের দৈয়ের সহিত বাটিয়া কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখিবে, পরে উক্ত ঔষধ চুলিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া মর্দ্দন করিলে এক দিবসেই চুলি আরোগ্য হয়।

১০। দাদের ঔষধ—গন্ধক, গেটেকড়ি ভস্ম ও গর্জ্জন তৈল একত্রে মিশাইয়া দাদে মালিশ করিলে সর্ব্ব প্রকার দাদ আরোগ্য হয়। ইহাতে জ্বালা করে না। (পরীক্ষিত)।

ডাঃ শ্রীসত্যপ্রিয় দত্ত।

বামারচনা।

অন্তর তম।

তুমি র'য়েছ হৃদে কেন যা দূরে তে যাই,
বারেক নয়ন মুদে তোমারে দেখিতে চাই।
জীবন-মুকুরে মোর, কালিমা প্রচুর—তায়
নিভৃতে দরশ দিলে নয়ন জুড়াই হায়।

শ্রীমতী—হে—জ—দেবী।

চলে গেছ।

যে দিন বরিনু তোমা পুত্র পরিচয়ে,
জন্ম জন্মান্তরে যেন কারুণ্য সঞ্চয়ে
ভরিল রমণী হিয়া, স্নেহের আবেশ,
জন্মাল মমতা প্রীতি অন্তরে অশেষ।
আপন নন্দনবৎ আনন্দে নয়ান
হেরিতে লাগিল তব ও বিধু বয়ান,
আত্মজেরি মত কল্যাণ কামনা
করিতে লাগিল হিয়া ভাবিল ভাবনা।
আজ তুমি চলে গেছ লোক লোকান্তরে,
পুত্র শোকাতুরা আমি অন্তরে অন্তরে।
ঝরিছে শোকের উৎস, চোখে স্নেহনীর,
মুছে ফেলি তাও ভাবি করুণা বিধির।

শ্রীমতী ক্ষীরোদ কুমারী ঘোষ।

ভ্রম সংশোধন—আষাঢ় মাসের পত্রিকার ৮১ পৃষ্ঠায় ঝিল্লিকা জাঁক স্থানে ঝিল্লিকা আঁক হইবে।

৩৭ নং মথুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক ৩০নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 626. October, 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৩ বর্ষ। ৬২৬ সংখ্যা। | আশ্বিন, ১৩২২। অক্টোবর, ১৯১৫। | ১০ম কল্প। ৪র্থ ভাগ।

আমাদের [illegible]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্লকুমার।

(১)

সব মাটি! আমার এত যত্ন, এত পরিশ্রম, সব পণ্ড! ভূতের বেগার খাটিলাম! কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্! এর মানেটা কি? সরলা তো রাজি হইয়াছিল, আমি বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, তাহার মুখেও বেশ প্রফুল্লতা প্রতিভাত হইয়াছিল, তবে বড় লজ্জায় যেন মরিয়া থাকিত, আমার সম্মুখে এ কয় দিন আদৌ আসিতে চাহিত না, তা লজ্জা হইবারই কথা, কিন্তু হঠাৎ এ পলায়নের অর্থ কি? মেজদিদির কল টেপা নহে তো? তাই বা কেন হবে? তিনি তো রাজি হইয়াছিলেন, আর তাঁর দ্বারা এরূপ লুকাচুরি খেলা তো সম্ভবেনা, তাঁর যদি আন্তরিক অমতই থাকিত, তবে তিনি প্রকাশ্যে তাহা বজায় রাখিতেন,—তাহা হইলে আমাদেরও এ সব আয়োজন করিবার সাধ্য হইত না।

তবে? তবে সরলার মনে হঠাৎ কোন ভাবান্তর হওয়াই বা অসম্ভব কিসে? তা হউক এখন কি করি? জোর করিয়া আনিয়া তো বিবাহ দেওয়া চলে না,—শেষে একটা কাণ্ড করিয়া বসিবে।

আচ্ছা ভাবান্তরই বা কেন হইল? যাই, শুনিলাম হিমী ফিরিয়া আসিয়াছে,

আর কাছে যদি কিছু কথা পাই, যাওয়াই সম্ভব, সরলা তো বিছানায় একখানা সামান্ত কাগজে লিখিয়া ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে "আমি শ্বশুরবাড়ী চলিলাম, পৌঁছিয়া সংবাদ দিব, চিন্তিত হইও না।"

মেজদিদির বাড়ী যাইলাম, মেজদিদির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার মুখে বিশেষ দুঃখের বা ভগ্নোৎসাহের লক্ষণ দেখিলাম না। আমি যাইতেই তিনি ঘরের ভিতর হইতে এক খানা পত্র আনিয়া আমার হাতে দিলেন, বুঝিতে বাকি রহিল না। একখানা সোফার উপর আড় হইয়া পড়িয়া পত্রখানি খুলিলাম, বলা বাহুল্য সরলার হাতের লেখা —মেজদিকে সম্বোধন করিয়া লেখা :—

পরম পূজনীয়া

শ্রীযুক্তা মেজদিদি-ঠাকুরাণী—

শ্রীচরণ-কমলেষু—

মেজদিদি !

বোধ হয় সবই বুঝিতে পারিয়াছ, এবং তুমি বোধ হয় এজন্য আমার উপর খুব রাগও করবে না। তবে একলাটি হিমীকে সঙ্গে করিয়া এবং কাউকে না বলিয়া চলিয়া আসাতে একটু রাগ হইবার কথা, কিন্তু আমি নিরাপদে পৌছিয়াছি শুনিয়া তোমার সে রাগ আর থাকিবে না। কি করিব ? এরূপ করা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিলাম না।

বিকাল বেলা যখন সাজিয়া গুজিয়া (ধিক আমার পাপ জীবনে) পুকুরপাড়ে বসিয়াছিলাম, তখন বামুনদের হেমা, টুনী, আর ঘোষেদের শৈল ও তাদের মেজ-বৌ এবং খুদী ঠানদিদি লুকাইয়া আমায় দেখিতে আসিয়াছিলেন, আমার সাজগোজ দেখিয়া, আমার ভাবন দেখিয়া, তাঁদের সাতপুরুষে যাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই—তাই স্বচক্ষে দেখিয়া, হাসিয়া পলাইয়া গেল। আমার বোধ হইতেছে, পাড়ার এবং গ্রামের সকলেরই আমায় দেখিবার জন্য ঐরূপ উৎকণ্ঠা হইয়াছিল, কেবল তোমার কড়া-কড়িতে পারিয়া উঠে নাই। তাই আজ বুঝি কি ছুতা নাতা করিয়া, কোন সুযোগে আসিয়া, তোমার চক্ষে ধুলা দিয়া, বিনা পয়সায় সং দেখিয়া, গেল। আশা করি আমার বর্ণনা এতক্ষণ বিলক্ষণ ডাল পালা সমেত গ্রামে রাষ্ট্র হইতেছে। যেখানে দুটি পাঁচটি মেয়েমানুষ জড়ো হইতেছে, সেই খানেই আমারই কথা হইতেছে—চিরকালই হইবে, যতদিন গ্রাম থাকিবে ততদিন হইবে, আরও কিছু চাও ?

আমি জানি তোমার আন্তরিক মত ছিল না, কেবল দাদা ও দাদাবাবুর মনক্ষুণ্ণ করিবার ভয়েই তুমি সায় দিয়াছিলে, আর তিন জনে মিলিয়া আমার শুকনো খড়ে আগুন ধরাইয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিলে, আমার ইহকাল পরকালের মাথা খাইতে বসিয়াছিলে, আমার জলন্ত যৌবনে ঘৃতের আহুতি দিয়া আমার নরকাগ্নিতে পোড়াইতে বসিয়াছিলে। কোন্ হিঁদুর মেয়ের না একথা শুনিলে গা শিহরিবে ? তোমার যুক্তি,

তর্ক, শাস্ত্রের নজির, ধর্ম্মের নজির সব জাহ্নবীর জলে নিক্ষেপ করিও,—তাহারাও পবিত্র হইবে।

এ পাপ জীবনে আর জন্মভূমি দর্শন করিব না, যাহার সম্মুখে পড়িব, সেই আঙ্গুল দিয়া দেখাইবে—তাহা কেমন করিয়া সহ্য করিব, মেজদিদি? যতদিন এ পাপ জীবন না যাইবে, ততদিন নারীর মহাতীর্থ স্থান শ্বশুরালয়েই থাকিব, বাপের বাড়ী এই পর্য্যন্ত। বুঝি এ জীবনে আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না—মেজদিদি—মেজদিদি গো—

দাদাকে বলিও, আমাকে যেন ক্ষমা করেন। দাদাবাবু যেন রাগ না করেন, তাঁদের পত্র লিখিতে আমি সাহস করিলাম না, তুমি আমার হইয়া বুঝাইয়া বলিও। তোমার কথা উভয়েই শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন—আজিও করিবেন, আর কি লিখিব? তোমায় মধ্যে মধ্যে পত্র দিব, উত্তর দিও। আর কি চাহিব? অনেক চাহিয়াছি,—যখন যাহা চাহিয়াছি, পাইয়াছি। আজ তোমরা তিন জনে প্রাণ ভরিয়া তোমাদের অভাগিনী জন্মদুঃখিনী বোনকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন অচিরে তাহার মৃত্যু হয়, যত দিন আমার চিতা-ভস্ম জাহ্নবী বারিতে বিধৌত না হইবে, ততদিন এ পাপের দাহ বুঝি নিবিবে না। হায় অদৃষ্টে তাও কি হইবে? তোমরা আমার প্রণাম গ্রহণ কর—ইতি

তোমাদের হতভাগিনী

সরলা।

২

এত কষ্ট করিয়া, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, যে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করিয়াছি, তাহার একটু আভাষ দিয়া রাখি।

বলিয়াছি তো, সরলার অকাল বৈধব্য আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়িয়াছিল। আমি জানিতাম, বালবিধবার পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা সব সমাজে, সব শাস্ত্রে, আছে—আমাদেরও শাস্ত্রে আছে। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক পরিশ্রম করিয়া, শাস্ত্রের সার মন্থন করিয়া, নজির বাহির করিয়াছেন, এবং অকাট্য প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব শাস্ত্র সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই। এখন লোকাচার এবং বর্ত্তমান সমাজসমস্যা ইহার প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। সরলার এমন না হইলে একথা আমার মনেও উদয় হইত না, এমন কি অন্যে এ সকল প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে, ঘৃণায় নাক সিঁট্‌কাইতাম এবং কত শত মিঠে কড়া বিদ্রূপ করিয়া লোকের কাছে রসিকতার বাহবা লইতাম। আজ নিজের গায়ে সাপের কামড় খাইয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, তাই এ বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য দত্ত মহাশয় ও মেজদিদির কাছে যাইলাম। আগে একবার বাবার কাছে এ কথা তুলিয়া ঝেঁটা খাইয়াছিলাম। গ্রামের অনেকে আমায় ছি ছি করিয়াছিলেন, সেই থেকে আজ তিন বৎসর চুপ করিয়াছিলাম, মনে ভাবিলাম এখন আবার একবার সব নাড়া চাড়া দিয়া দেখিব—

দেখি সত্যেন্দ্রনাথ (দত্ত মহাশয়) কি বলেন, মেজদিদি বা কি বলেন।

সত্যেন্দ্র নাথ পাঠ্যাবস্থায় পুরা সাহেব ছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজে যাইতেন পৌত্তলিকতাকে ঘৃণা করিতেন, স্ত্রী স্বাধীনতার জন্ত তর্ক করিতেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম্ এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া বিলাতে যাইবার জন্ত ও একবার নাচিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা সাহেবী পোষাকে থাকিতেন—সাহেবী পোষাকে তাঁর চেয়ে ভাল দেখাইতে আমি খুব কম ভারতবাসিকেই দেখিয়াছি। হঠাৎ তাঁকে দেখিয়া পার্শী অথবা কাশ্মিরী বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু আমার দেবী-প্রতীমা মেজদিদির পবিত্র স্নিগ্ধ সাহচর্য্যে তাঁহার এ সব ভাব এখন অনেকটা গিয়াছে। (যাক্ সে সব কথায় আমার কাজ নাই)। মেজদিদি আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-রূপিণী, তাঁর সহোদর হইয়া আজ আমিও ধন্ত।

সত্যেন্দ্রবাবু মেজদিদিকে উচ্চ শিক্ষা দিয়াছেন, আবার মেজদিদিও তাঁহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। যেন সত্যেন্দ্র নাথ অগ্নি, মেজদিদি তুষার—দুইয়ের সংস্পর্শে জীবনী-শক্তি-দাত্রী স্নিগ্ধ স্রোতস্বতী বহিয়াছে। মেজদিদি প্রথমে ভারি গোঁড়া ছিলেন, সত্য বাবু একদম্ সাহেব ছিলেন, এখন দুটাতে মিশিয়া দুজনেই সহজ পথে চলিতে শিখিয়াছেন। এই সামঞ্জস্য সুন্দর ও স্বাভাবিক—দেখিয়াও সুখ।

আমার পরামর্শ লইবার এমন স্থান আর আমি কোথায় পাইব? তাই এখানে আসিলাম, মেজদিদির কাছে গিয়া আমার উদ্দেশ্য জানাইলাম, কিন্তু তিনি আমায় অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া বলিলেন "তুই আজ কাল বড় বেহায়া হয়েছিস্, বছর কএক ক'লকাতায় থেকে একেবারে উৎসন্ন গেছিস্, বড় মুড়ুলী করিতে শিখেছিস্, আমার সামনে দাঁড়াইয়া ওসব কথা বলিতে একটু লজ্জাও করে না? আগে যে ক'লকতা থেকে বাড়ী এলে 'বৌ কেমন আছে'—জিজ্ঞাসা করলে লজ্জায় কান লাল হ'য়ে উঠ্‌তো সাম্‌নে দাঁড়াতে পারতিস্ না! আর আজ বাবা নাই ব'লে, সংসারের কর্ত্তা সেজে বড়——" আর বলিতে পারিলেন না, বাবার নাম করিতে কোমল-হৃদয়া মেজদিদির চক্ষে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল বহিয়া আসিল, আমি বেকুব হইয়া ফিরিবার চেষ্টা দেখিলাম, তখন অর্দ্ধ রুদ্ধ কণ্ঠে চক্ষু মুছিতে মুছিতে আমায় ডাকিয়া বলিলেন "এখন বাড়ী যাস্‌নে, আমার ঘরে গিয়া বোস্, খাবার নিয়ে যাচ্ছি।" আমি তাঁহার ঘরে না গিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া, বাহিরে সত্যেন্দ্র নাথের কাছেই আসিলাম।

মেজদিদি আমার চেয়ে চারি বৎসরের মাত্র বড়। কিন্তু তাঁহার চেয়ে অধিক ভয় ও ভক্তি করি, এমন কেহ আপাততঃ পৃথিবীতে জীবিত নাই। আমি যে ঠিক হিসাব করিয়া বা বিচার করিয়া কর্ত্তব্য-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ করি তাহা

নহে। তাঁহার সেই আদর মাখানো বীণাধ্বনিবৎ কণ্ঠস্বরে, আর সর্ব্বোপরি তাঁহার সেই বাসন্তী প্রতীমার মত স্নিগ্ধোজ্জল দেবী-মূর্ত্তিতে কি যে শক্তি লুক্কাইত আছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, যেন তাঁর কাছে আমি কতক্ষুদ্র, বয়সে কত ছোট, জ্ঞানে কত মূঢ়। বুঝিয়াছি, এ শক্তি কেবল সেই মহা-শক্তির সাক্ষাৎ সজীব প্রতিমূর্ত্তি নারীতেই সম্ভবে,—আর কোথাও নহে—How divine a thing a woman can be! কেন, কে না দেখিয়াছ, চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া তরুণী, কেমন গৃহিণী সাজিয়া, একটি বৃহৎ সংসারের "মা" হইয়া বসিতে পারেন? নারী যে মায়ের জাতি, এই মায়ের জাতির প্রতিও যে নরাধম অধর্ম্মাচরণ করিতে পারে, সে নরকের কুক্কুর? আর এই পবিত্র নারী-জন্ম গ্রহণ করিয়া যাহার মা হইবার শক্তি নাই, পুরুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণের শক্তি নাই, তাহাকে কি বলিব? থাক—

(৩)

বৈঠকখানায় গিয়া সত্যেন্দ্রনাথের কাছে এ কথা পাড়িতেই তিনি বলিলেন, "তোমার আগে থেকেই সে ভাবনা আমার মনে আসিয়াছে, কা'ল রাত্রিতে এ কথা লইয়া তোমার মেজদিদির সঙ্গে আমার ভয়ানক ঝগড়া হইয়া গিয়াছে, তিনি তো রাগিয়াই অস্থির। এখন কি করি বল দেখি?"

আমি। মেজদিদির অমত থাকিলে, এ প্রসঙ্গ লইয়া অগ্রসর হওয়া কতদূর সম্ভব, ও উচিত হইবে বলিয়া বিবেচনা কর?

স। এক বিন্দুও নহে, আমার সাধ্য কি? তুমি তো অজ্ঞান নও, তাঁকে বিলক্ষণ জান তো।

আ। কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁহাকে যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় কি?

স। বোধ তো হয়। আমার ইহাও জানি, আমার মত থাকিলে অবশেষে তাঁর মত হইবেই—তিনি ইচ্ছা করিয়া আপনার মত আমার মতে ডুবাইয়া ফেলিবেন। কিন্তু কেবল আমার জিদ্ রক্ষার জন্য তাঁহার স্বাধীন স্বতঃ উদ্ভূত মতকে আমার মতের অনুবর্ত্তী করিতে আমার প্রবৃত্তি হইবে না—সত্যেন্দ্রনাথের তাহা সাধ্যাতীত—

সত্যেন্দ্রনাথের চক্ষু ছল ছল হইল, কণ্ঠস্বর ভারী হইল। স্বর্গ আর কোথায়?—আমিও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। সত্যেন্দ্রনাথ অতি কষ্টে দুই তিন বার ঢোক্ গিলিলেন, চক্ষু দুইটি আবার একটু শুক-ইয়া আসিল, মুখের অন্যমনস্কতার ভাব গিয়া একটু সাধারণ ভাব আসিল, তখন আমি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখন তবে উপায়"?

স। তোমার মেজদিদির প্রবল ভগ্নী-স্নেহ এবং তাঁহার কুশাগ্র বুদ্ধি আমায় সাহায্য করিবে, এই ভরসায় আশা করি-তেছি যে, অবশেষে তাঁহার মত হইবে। এখন

হঠাৎ বড় ঘা লাগিয়াছে—এত পুরুষের বংশপরম্পরাগত সংস্কার কোথায় যাইবে?

আ। তারপর—সরলা?—

স। সে তখন আমি বুঝিয়া লইব—সে ভার আমার।

আ। পাত্র? পুরোহিত?

স। সেজন্তও তোমাকে ভাবিতে হইবে না—সে সকল ভারও আমার।

আ। এখন সমাজ।

স। সেইটাই প্রধান কথা। দেখি, কতদূর কি করিয়া তুলিতে পারি। সর্ব্বপ্রথমে চন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে পাড়িতে হইবে। তিনিই গ্রামের ও সমাজের নেতা, প্রবীণ, জমিদার, আবার এম্-এ, বি-এল্, কিন্তু তিনি বড় গোঁড়া। তাঁকে এ বিষয়ে পাড়িতে পারিলে আর ডরাই না। তাঁর প্রতি আমার অটল শ্রদ্ধা, তাঁর অনভিমতে আমি কিছুই করিতে পারিব না। অন্ত লোকের জন্ত বড় ভাবি না, সব ঠাণ্ডা করিতে পারিব। অধিকন্তু, গ্রামে ও সমাজে এতগুলি নব্য ও শিক্ষিত যুবক আছে, তাহারা প্রত্যেকেই আমাকে বিলক্ষণ মান্য করে, এবং প্রত্যেককেই বুঝাইলে বুঝিবে। কারণ, আমি জানি, তাহাদের মধ্যে কেহই স্ত্রীলোককে কেবল পুরুষের সুখের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করে না, পরন্তু স্ত্রীজাতিকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধা করে। তাহারাও এ সৎ-কার্য্যে উদ্যোগী হইয়া আমার ও ভবিষ্যৎ সমাজের সাহায্য করিবে। এখন বাকি রহিলেন তর্ক-রত্ন মহাশয়।

আ। হাঁ, তিনি তো এ কথা শুনিলে আমাদের আর মুখদর্শন করিবেন না, তাঁকে লইয়াই সমস্যা। স্বর্গীয় বিদ্যা-রত্ন মহাশয় আমাদের সঙ্গে মিশিতেন, আমাদের কাছে পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্র শুনিতেন, আর হাসিয়া হাসিয়া আমাদের সব 'ইংলিশম্যান' বলিতেন। তিনি আমাদের সঙ্গে সরল ভাবে কত কৌতুক করিতেন, কত বেদান্তের কথা বলিয়া আমাদের কিশোর প্রাণে অমৃত বর্ষণ করিতেন। এ সব দেখিয়া তর্ক-রত্ন ঠাকুরদাদা জলিয়া যাইতেন, বলিতেন "বিদ্যারত্ন ভায়াও দেখ্‌ছি গোল্লায় গেলে"।

স। তিনি আমার উপরেও সম্প্রতি একটু চটিয়াছেন। সে দিন সকাল বেলা আমার এখানে বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ বিশ্বপ্রেমে অভিভূত হইয়া আমার পিণ্ডের যোগাড় করিতেছিলেন, কিন্তু আমার পিণ্ডের লোভ কম দেখিয়া বড় হতাশ হইয়াছেন, একটু রাগও করিয়াছেন।

আ। তা'র কারণ?

স। তার কারণ,—যেহেতু তোমার মেজদিদি-রূপ বৃক্ষে আজিও ফল ধরিল না, সেই হেতু, তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে, আমাকে এতদিন বৃক্ষান্তর অবলম্বন করা অর্থাৎ আর একটী স্ত্রীরত্ন সংগ্রহ করা উচিত ছিল। এতদিন যে করি নাই, ইহা অপেক্ষা আমার বোকামীর প্রমাণ আর হইতে পারে না। তাঁর সন্ধানে যে একটী ভাল পাত্রী আছে, সে প্রলোভনও সম্মুখে ধরিয়া

ন্যায়ের যুক্তির অঙ্গ-পূরণ করিতে ক্রটী করেন নাই।

আ। তারপর?

স। আমি বলিলাম "সাধু, সাধু!!"

আ। তারপর?

স। তারপর আমাকে এ বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন।

আ। চিন্তা করিয়াছিলে বোধ হয়?

স। আলবৎ। গভীর চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইয়া, পাক্কা ছয় ঘণ্টা হাবুডুবু খাইয়া, যে সিদ্ধান্ত-রত্নের উদ্ধার করিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে এই যে,—বুড়া বয়সে কে আবার প্রেক্টিস্ খাটিতে বসিবে?

আমি বলিলাম "এখন বাজে কথা রাখ, কাজের কথা বল।"

স। কাজের কথা আর কি, যেমন করিয়া হোক তর্ক-রত্ন মহাশয়কে তো চাই। যা হোক, সমাজে যখন তাঁর এতদূর পসার প্রতিপত্তি যখন তিনি খবরের কাগজে মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আর্টিকেল্ লেখেন, তাঁকে চাই বৈ কি। নতুবা কিছু বেশী করিয়া ঝাড়িলেই "মাকড় মারিলে ধোকড়" হইবে। দেখা যাক্। তুমি একবার তাঁর ওখানে যাও, তোমার সঙ্গে বনে ভাল। আমি ততক্ষণ চন্দ্রনাথ বাবুর কাছ থেকে হ'য়ে আসি এ ব্যাপারে কাঁটা লাথি অনেক খাইতে হইবে, মেজাজ ঠিক রাখিও—তোমার তো যে মুখ।

আ। আমার মুখের জন্য আর ভাবিতে হইবে না। শ্রীমতীর কল্যাণে এখন এ মুখ অনেক নরম হইয়া আসিয়াছে। তবে মাঝে মাঝে ছুট্ ছাট্ বাহির হইয়া পড়ে—সেটা আগেকার অভ্যাস দোষে।

স। চিরকাল কি পাগল থা'কতে আছে? ছোট বেলায় তোকে সকলে পাগলই বলিত, যাকে যা ইচ্ছা বল্‌তিস্—কেউ কিছু মনে ক'রত না। দেখ্ দেখি, তর্ক-রত্ন মহাশয় ব্রাহ্মণ, আর তুই তাঁকে কি না বলিস্, কিন্তু তিনিও তোকে কিছু বলেন না। এখন বড় হয়ে'ছস্ একটু বুঝে চলতে হবে।

আ। যে আজ্ঞা প্রভু—যে আজ্ঞা।

(৪)

মেজদিদি যে খাবার আনিয়াছিলেন, তাহা গো গ্রাসে উদরস্থ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলাম এবং তর্ক-রত্ন ঠাকুরদাদার রাশ-মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। তখনো বেশ বেলা আছে।

শিষ্য, সেবক ও যজমানদের কল্যাণে এবং মোটা মোটা শ্রাদ্ধের বিদায়ের দৌলতে তর্ক-রত্নমহাশয়ের অবস্থা বেশ ভালই। পাঁচ ছয়টা কুঠারী, দরদালান, পূজার দালান, একটি ফুলবাগান ইত্যাদি সবই আছে, কোন অভাব নাই। বামুন কায়েতের ঘরে মেয়েরও অভাব নাই, ছুটা খাইতে দিতে পারিলেই যখন ইচ্ছা, যেমনটী ইচ্ছা, যত গুলি ইচ্ছা পাওয়া যায়। এক গৃহিনীর একটু বয়স বেশী হওয়াতেই গৃহিণান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। তবে দুঃখের বিষয়, শুনিয়াছি তাঁহার শেষ

গৃহিনী কিছু প্রখরা—তেমন good boy টীর মত পোষ মানিতেছেন না। বলা বাহুল্য তর্ক-রত্ন মহাশয় কুলীন বংশ-সম্ভূত। তাঁহার পিতামহের আমল হইতেই "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের" ব্যবসা আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইনিও সেই পথাবলম্বন পূর্ব্বক চারিটী গৃহিণী পরিবেষ্টিত হইয়া চতুর্বর্গ-ফল-লাভ করিতেছেন। যেহেতু শাস্ত্রে বলে "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ," এবং তিনি খোদ এক জন হিন্দু ধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ, এজন্য চারিটী জীবন্ত মেয়েমানুষকে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, যথাক্রমে এই চারিটী সোপান-রূপে নিয়োজিত করিয়া, তার উপর দিয়া স্বর্গে উঠিবার আয়োজন করিতেছেন।

আমি গিয়া বরাবর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। যাহারা সহর-বাসী তাহারা হয়ত এ কথা শুনিয়া শিহরিবে, কিন্তু আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক আমাদের অতশত নাই। গিয়া দেখি ছোট ঠান্‌দিদি দালানে বসিয়া মেজ-ঠানদিদিকে দিয়া চুল বাধাইতেছেন। তিনি বাঁ হাতে চুলের গোড়ার সরু ফিতার দুই অগ্রভাগ মুখের দুই পাশ দিয়া আনিয়া, টানিয়া ধরিয়া আছেন, এবং ডা'ন হাতে দো-ঠেঙ্গা আয়না খানিকে অনেক রকম করিয়া একা'ত ওকা'ত করিয়া ধরিয়া, অতি মনোযোগের সহিত তাহার পেটের মধ্যে চাপিয়া আছেন। তাঁর মুখে আনন্দের সঙ্গেও যেন একটু বিরক্তির ভাব মাখান, —বোধ হয় আরনাখানিকে কোন রকম করিয়া ধরিয়া মুখ খানা এর চেয়ে কেন ভাল দেখাইতেছে না, ইহাই বিরক্তির কারণ। আশে পাশে চিরুণী,কাঁটা, ফিতা, গুছি, তেলের বাটি, সিঁদুর কৌটা, তরল আল্‌তার শিশি, একখানি রঙ্গিন আধ্-ভিজা গামছা ইত্যাদি ছড়ান রহিয়াছে। আমার চটি জুতার শব্দ নিকটস্থ হইতেই ছোট-ঠান্‌দিদি একটু সাম্‌লাইয়া বসিলেন। মেজ ঠান্‌দিদি আহ্লাদ সহকারে আমাকে সম্ভাষণ করিলেন "এস দাদা এস, বলি আজকাল না'তবৌকে ফেলে বুঝি বাড়ী থেকে বেরুতে পারিস্ নে? আগে যখন ক'ল্‌কেতা থেকে বাড়ী আস্‌তিস্, তখন যে সকলের আগে এ'সে আমাদের সঙ্গে দেখা করতিস্, সমস্ত গাঁ রৈ রৈ ক'রে বেড়াতিস্, এখন বুঝি না'ত বৌ আর বেরুতে দেয় না?" আমি বলিলাম "হাঁ গো হাঁ, এখন ঠাকুর দাদা কোথায়?" তিনি বলিলেন "কেন?" আমি বলিলাম "তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করা ছাড়া আমার আর কি কাজ থাকে?—কোথায় তিনি?" মেজ ঠান্‌দিদি ঠোঁট দুটী দাঁতে একটু চাপিয়া, ভ্রু-দুটী টান করিয়া, সেই সঙ্গে চখের তারা দুটি উপরে তুলিয়া ঘাড় উঁচু করিয়া ইসারা করিলেন "উপরে" অর্থাৎ ছাদে।

ছোটঠান্‌দিদি এতক্ষণ আঁচলে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছেন। তাঁর মাথা অবশ্য খোলা, যেহেতু মেজ ঠানদিদির হাত চলিয়াছে, বিউনি প্রায় শেষ হইয়াছে। আমার মুখ চুলকাইয়া উঠিল, বলিয়া ফেলিলাম ছোটঠান্‌দিদি! মুখত ঢাকিলে,

মাথা যে খোলা, আমার তো খুব মান রাখিলে দেখ্‌ছি"। বলিতে বলিতে ছোট ঠান্‌দিদির অঙ্গ-যষ্টি থাকিয়া থাকিয়া সামান্য ঝাঁকিয়া উঠিতে লাগিল, বুঝিলাম নাভিকুণ্ড হইতে হাসির কতকগুলি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ ক্রমে উপর পানে উঠিতেছে। মেজ-ঠান্‌দিদি আমায় বলিলেন "তুই শালা আপার মানুষ", আমি বলিলাম "উঁহু"। এতক্ষণে হাসির বুদ্বুদ গুলি ছোট ঠান্‌দিদির গলা ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছিল, এবং তাঁহার অধরোষ্ঠ দাঁতে চাপা দেখিয়া পথ না পাইয়া, নাসিকা দ্বারা বাহির হইতে লাগিল। সেই চাপা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মেজ ঠান্‌দিদির একটি চাপা চড় চপাট শব্দে তাঁর পিঠের উপর পড়িল, আমিও সময় নষ্ট করা অন্যায় বিবেচনায় চটির পট্‌ পট্‌ শব্দ করিয়া সিঁড়ির ঘরের দিকে চলিলাম। দেখিলাম তর্করত্নের ভ্রাতুষ্পুত্র-রত্ন শ্রীমান বিভূতি ভূষণ আল্‌-বার্ট ফ্যাসনে কেশ বিন্যাস করিয়া পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আমায় বলিলেন "কিহে—বাবাজি যে?" আমি একটা 'হুঁ' দিয়া পট্‌ পট্‌ করিয়া বীর দর্পে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। ইদানীং তর্করত্ন মহাশয়কে দেখিয়া আমার বড় হাসি পাইত, কারণ তাঁর দিকে চাহিলেই "অলিভার টুইষ্টের" গোড়ায় যে এক "বীডলের" ছবি আছে, আমার তাই মনে পড়িত। ঠিক তেমনি তাঁর কান্তি-পুষ্টি। এজন্য সিঁড়িতে একটু দাঁড়াইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া লইলাম। বলিয়া রাখি,—বিভূতি ভূষণ আমারই বয়সী।

উপরে গিয়া দেখি তর্করত্ন ঠাকুরদাদা আলিসার উপর একটী নেড়া সেজির টবের পার্শ্বে বসিয়া আকাশের পানে চাহিয়া আছেন। বাম হস্তে ভুঁড়ীতে হাত বুলাইতেছেন এবং দক্ষিণ হস্তে একখানি ঝালর দেওয়া পাখা, মধ্যে মধ্যে নাড়িতেছেন। বেলা অধিক নাই, গাছের মাথায় কোথাও একটু আধটু ভাঙ্গা চুরা রৌদ্র আছে, গরমও বিলক্ষণ পড়িয়াছে। আমায় দেখিয়াই একটু থতমত হইয়া বসিলেন, বলিলেন "কিরে পাগ্‌লা! তোকে আর আজ কা'ল দেখি না কেন?"

"আজ্ঞে না দেখ্‌লে আর কি করিব? আমিতো পালিয়ে থাকি না। বলি এখানে বসিয়া আকাশ পানে চাহিয়া আছেন কেন? সেজ ঠানদিদিতো আজ এক মাস বাপের বাড়ী গিয়াছেন, এতেই এত?"

তর্ক—দূর শালা উল্লুক! কেবল পাগ্‌লামী ক'রেই রাত্রিদিন বেড়াবি। —ওরে তোর নাকি বৌ পছন্দ হয় নাই? তোর দিদি বল্লে "ঘরে এক অলক্ষ্মী ঢুকে অলক্ষণ হ'য়েছে।" তুইও নাকি বিয়ের পর থেকে কেমন তর হ'য়ে গেছিস্? তুইতো বরাবরই পাগল, নইলে আর আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিস্? কলিকাল কি না! আমি আরও যাতে তোর ভবিষ্যতে ভাল হয়, সেই জন্য বেছে

বেছে এই মেয়ে ঠিক ক'রলাম, এমন কুলীনের মেয়ে, তায়া বনিয়াদি ঘর—

আ—সেজন্ত চিরবাধিত আছি।

তর্ক—তবে তোর বোন অমন কথা কেন বলে? আবার ছুঁড়ী বলে কি না "শ্রী-হীনা স্ত্রীলোক লক্ষ্মী-ছাড়া—কারণ শ্রী অর্থেই লক্ষ্মী—শাস্ত্রের বচন", সরোজিনী আজ কাল ভারী পণ্ডিত হ'য়েছে! আমায় আবার সব পুরাণ থেকে নজির শুনায়। বিদ্যারত্ন ভায়া আরও ওকে মাটি ক'রে গিয়েছেন। এদিকে সরোজিনী খুব সাহেবী কায়দায় ঘরদুয়ার সাজিয়ে রাখে। বোধ হয় সভ্য নিজে পর্য্যন্ত কখনও তাকে একটা চুরুট এনে দিতে অনুরোধ করে না। সে নাকি বাড়ী থেকে এক পা গাড়ী ভিন্ন যায় না, সিল্‌কের পোষাক না প'রে বাড়ী থেকে বেরোয় না। আবার শুনেছি বিদ্যারত্নকে সে নিজে হাতে তামাক সেজে এনে দিয়েছে। নল তৈয়ার করিবার জন্ত পাতা পেড়ে এনে দিয়েছে—এদিকে জো ঘাড়িতে এত চাকর চাকরাণী। সে আমায় কি না বলে "আপনার কি প্রকৃতির প্রতি একটু দয়াও হয় নাই?" আরে গেলরে—

আ—সে সব কথায় কি কান দিতে আছে?

তর্করত্ন মহাশয় হঠাৎ বলিলেন "তোর মুখখানি বেশ। তবে তোর পেটে পেটে অত নষ্টামি কেন?"

আমি বলিলাম, "জন্মলগ্নের দোষ। বলি সে কথা যাক্, এখন একটু ভক্তি রসে মন দিলেই তো বেশ ভাল দেখায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ নিসৃত সেই গীতামৃতখানি কি এ বয়সে পছন্দ হয় না?

তর্ক—আমার হয় না, তোর নাকি হয়? তোরা ত ঘোর নাস্তিক। আমি যে গীতার অনুবাদ ক'রে রেখেছি,... শীঘ্রই ছাপ্‌তে যাবে, আহা! ঠাকুর কি লীলাটাই করেছেন!

(ক্রমশঃ)

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভদ্রলোকের বাটীতে দুধের আবশ্যক। দুগ্ধ ভিন্ন গৃহস্থের চলে না। সন্তান সন্ততি সকল বাটীতেই আছে। লক্ষ্মীর কৃপা যত হউক না হউক ষষ্ঠীর কৃপা বিলক্ষণ। সুতরাং দুধ লোকমাত্রেরই নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। দুগ্ধবিক্রেতা "ঘোষী" ও গোয়ালা নামে খ্যাত। তন্মধ্যে ঘোষীগণ হিন্দু। তাহারা কেবল মাত্র মহিষ পুষিয়া থাকে। মহিষের দুগ্ধ বিক্রয় ব্যতীত তাহাদের অন্য কোন পেষা নাই। তাহারা হালোয়াইকে (ময়রাকে) দুধ বিক্রয় করে এবং খোয়া (ক্ষীর) প্রস্তুত করিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে ক্ষীর পাতলা

মাথা যে খোলা, আমার তো খুব মনে রাখিলে দেখ্‌ছি"। বলিতে বলিতে ছোট ঠান্‌দিদির অঙ্গ-যষ্টি থাকিয়া থাকিয়া সামান্য ঝাঁকিয়া উঠিতে লাগিল, বুঝিলাম নাভিকুণ্ড হইতে হাসির কতকগুলি ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ ক্রমে উপর পানে উঠিতেছে। মেজ-ঠান্‌দিদি আমায় বলিলেন "তুই শালা আবার মানুষ", আমি বলিলাম "উঁহু"। এতক্ষণে হাসির বুদ্‌বুদ গুলি ছোট ঠান্‌দিদির গলা ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছিল, এবং তাঁহার অধরোষ্ঠ দাঁতে চাপা দেখিয়া পথ না পাইয়া, নাসিকা দ্বারা বাহির হইতে লাগিল। সেই চাপা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মেজ ঠান্‌দিদির একটি চাপা চড় চপ্‌চট শব্দে তাঁর পিঠের উপর পড়িল, আমিও সময় নষ্ট করা অন্যায় বিবেচনায় চটির পট্‌ পট্‌ শব্দ করিয়া সিঁড়ির ঘরের দিকে চলিলাম। দেখিলাম তর্করত্নের ভ্রাতুষ্পুত্র-রত্ন শ্রীমান বিভূতি ভূষণ আল্‌-বার্ট ফ্যাসনে কেশ বিন্যাস করিয়া পার্শ্বের ঘর হইতে বাহির হইয়া আমায় বলিলেন "কিহে—বাবাজি যে?" আমি একটা 'হুঁ' দিয়া পট্‌ পট্‌ করিয়া বীর দর্পে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। ইদানীং তর্করত্ন মহাশয়কে দেখিয়া আমার বড় হাসি পাইত, কারণ তাঁর দিকে চাহিলেই "অলিভার টুইষ্টের" গোড়ায় যে এক "বীডলের" ছবি আছে, আমার তাই মনে পড়িত। ঠিক তেমনি তাঁর কান্তি-পুষ্টি। একন্য সিঁড়িতে একটু দাঁড়াইয়া মুখ গম্ভীর করিয়া লইলাম। বলিয়া রাখি,—বিভূতি ভূষণ আমারই বয়সী।

উপরে গিয়া দেখি তর্করত্ন ঠাকুরদাদা আলিসার উপর একটা নেড়া সেজির টবের পার্শ্বে বসিয়া আকাশের পানে চাহিয়া আছেন। বাম হস্তে ভুঁড়ীতে হাত বুলাইতেছেন এবং দক্ষিণ হস্তে এক খানি ঝালর দেওয়া পাখা, মধ্যে মধ্যে নাড়িতেছেন। বেলা অধিক নাই, গাছের মাথায় কোথাও একটু আধটু ভাঙ্গা চুরা রৌদ্র আছে, গরমও বিলক্ষণ পড়িয়াছে। আমায় দেখিয়াই একটু থতমত হইয়া বসিলেন, বলিলেন "কিরে পাগ্‌লা! তোকে আর আজ কা'ল দেখি না কেন?"

"আজ্ঞে না দেখ্‌লে আর কি করিব? আমিতো পালিয়ে থাকি না। বলি এখানে বসিয়া আকাশ পানে চাহিয়া আছেন কেন? মেজ ঠানদিদিতো আজ এক মাস বাপের বাড়ী গিয়াছেন, এতেই এত?"

তর্ক—দূর শালা উল্লুক! —কেবল পাগ্‌লামী ক'রেই রাত্রিদিন বেড়াবি। —ওরে তোর নাকি বৌ পছন্দ হয় নাই? তোর দিদি বলে "ঘরে এক অলক্ষ্মী ঢুকে অলক্ষণ হ'য়েছে।" তুইও নাকি বিয়ের পর থেকে কেমন তর হ'য়ে গেছিস্‌? তুইতো বরাবরই পাগল, নইলে আর আমার সঙ্গে ইয়ারকি দিস্‌? কলিকাল কি না! আমি আরও যাতে তোর ভবিষ্যতে ভাল হয়, সেই জন্য বেছে

খেছে এই মেয়ে ঠিক ক'রলাম, এমন কুলীনের মেয়ে, তায় বলিয়াদি ঘর—

আ—সেজন্ত চিরবাধিত আছি।

তর্ক—তবে তোর বোন অমন কথা কেন বলে? আবার ছুঁড়ী বলে কি না "শ্রী-হীনা স্ত্রীলোক লক্ষ্মী-ছাড়া—কারণ শ্রী অর্থেই লক্ষ্মী—শাস্ত্রের বচন", সরোজিনী আজ কাল ভারী পণ্ডিত হ'য়েছে! আমায় আবার সব পুরাণ থেকে নজির শুনায়। বিদ্যারত্ন ভায়া আরও ওকে মাটি ক'রে গিয়েছেন। এদিকে সরোজিনী খুব সাহেবী কায়দায় ঘরদুয়ার সাজিয়ে রাখে। বোধ হয় সত্য নিজে পর্য্যন্ত কখনও তাকে একটা চুরুট এনে দিতে অনুরোধ করে না। সে নাকি বাড়ী থেকে এক পা গাড়ী ভিন্ন যায় না, সিল্কের পোষাক না প'রে বাড়ী থেকে বেরোয় না। আবার শুনেছি বিদ্যারত্নকে সে নিজে হাতে তামাক সেজে এনে দিয়েছে। নল তৈয়ার করিবার জন্ত পাতা পেড়ে এনে দিয়েছে—এদিকে তো বাড়িতে এত চাকর চাকরাণী। সে আমায় কি না বলে "আপনায় কি প্রভুর প্রতি একটু দয়াও হয় নাই?" আরে গেলরে—

আ—সে সব কথায় কি কান দিতে আছে?

তর্করত্ন মহাশয় হঠাৎ বলিলেন "তোর মুখখানি বেশ। তবে তোর পেটে পেটে অত নষ্টামি কেন?"

আমি বলিলাম, "জন্মলগ্নের দোষ। বলি সে কথা যাক্, এখন একটু ভক্তি রসে মন দিলেই তো বেশ ভাল দেখায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ নিঃসৃত সেই গীতামৃতখানি কি এ বয়সে পছন্দ হয় না?

তর্ক—আমার হয় না, তোর নাকি হয়? তোরা ত ঘোর নাস্তিক। আমি যে গীতার অনুবাদ ক'রে রেখেছি, এ. শীঘ্রই ছাপ্‌তে যাবে, আহা! ঠাকুর, কি লীলাটাই করেছেন!

(ক্রমশঃ)

বারাণসী-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভদ্রলোকের বাটীতে দুধের আবশ্যক। দুগ্ধ ভিন্ন গৃহস্থের চলে না। সন্তান সন্ততি সকল বাটীতেই আছে। লক্ষ্মীর কৃপা যত হউক না হউক ষষ্ঠীর কৃপা বিলক্ষণ। সুতরাং দুধ লোকমাত্রেরই নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। দুগ্ধবিক্রেতা "ঘোষী" ও গোয়ালা নামে খ্যাত। তন্মধ্যে ঘোষীগণ হিন্দু। তাহারা কেবল মাত্র মহিষ পুষিয়া থাকে। মহিষের দুগ্ধ বিক্রয় ব্যতীত তাহাদের অন্ত কোন পেষা নাই। তাহারা হালোয়াইকে (ময়রাকে) দুধ বিক্রয় করে এবং খোয়া (ক্ষীর) প্রস্তুত করিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে ক্ষীর পাতলা

হইয়া থাকে কিন্তু এদেশের ক্ষীর গাঢ়। গোয়ালারা আহীর বা খাড়ারিয়া জাতি ভুক্ত। তাহারা গরু ও মহিষ পুষিয়া থাকে। ইহারা দুগ্ধ প্রায় বিক্রয় করে না। তবে কেহ ফরমাইস করিলে তাহা যোগাইয়া থাকে। তাহারা বাটীতে আবশ্যক মত দুধ দেয় এবং গাভী লইয়া লোকের দুয়ারে দোহন করিয়া দেয়।

উত্তম শ্রেণীর মহিষের মূল্য ৭০ বা ৮০ টাকা। এ সকল মহিষ ১২ হইতে ১৬ সের পর্য্যন্ত দৈনিক দুগ্ধ দিয়া থাকে। এই দুগ্ধ হইতে সের করা এক বা দেড় ছটাক নবনীত অথবা ঘৃত প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাধারণ শ্রেণীর মহিষের মূল্য ২০ হইতে ৩০ টাকা। এ সকল মহিষ ৭ হইতে ১২ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া থাকে। উত্তম শ্রেণীর গাভীর মূল্য ২০ হইতে ৪০ টাকা। ৮ হইতে ১৪ সের দুগ্ধ উত্তম শ্রেণীর গাভী হইতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর গাভীর দর ৪ হইতে ১০ টাকা। সে সকল গাভী ২ হইতে ৫ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ দিয়া থাকে।

প্রথম শ্রেণীর মহিষ পুষিতে দিন ॥৶০ দশ আনা খরচ পড়ে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ঐ ঐ ।৶০ আনা।
প্রথম শ্রেণীর গাভী ঐ ॥০ আনা।
দ্বিতীয় ঐ ঐ ঐ ৶০ আনা।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মহিষের গোবর হইতে দিন দুই পয়সা এবং গাভীর গোবর হইতে সওয়া দুই পয়সা লাভ হইয়া থাকে।

আজকাল টাকায় দুগ্ধ ৮ সের এবং ঘৃত ১৩ ছটাক। নবনীত টাকায় এক সের। ঘোষী বা গোয়ালারা ধর্ম্মত কার্য্য করে না। সুতরাং তাহাদিগের উপর বিশ্বাস রাখা যায় না। তাহারা প্রত্যেক তিন সের দুগ্ধে এক পোয়া ঘোল মিশাইয়া দেয়। মহিষ বৎসরে ১০ মাস এবং গাভী আট মাস দুগ্ধ দিয়া থাকে। মহিষ বা গাভীর দুধ ৬ মাস কাল পর্য্যন্ত পূর্ণ মাত্রায় থাকে পরে এক তৃতীয়াংশ এবং তৎপরে দেড় ভাগ কমিয়া যায়।

মহিষ হইতে কিরূপ লাভ হইয়া থাকে তাহা বলিতেছি :—

ষোল সের দুধ হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত নবনীত ৪ ছটাক, ঘোল ৩¾ সের, খাঁটি দুধ ১২ সের পাওয়া যায়। ইহার দাম যথাক্রমে চারি আনা, সাড়ে পনের আনা এবং ঘুঁটের দাম দুই পয়সা। একুনে ১ টাকা ।০ চারি আনা ৬ পাই।

মোট কথা খরচ খরচা বাদ দুগ্ধ বিক্রেতার বৎসরে ১০৩ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হয়।

(ক্রমশঃ)

রাজা রাম মোহন রায়ের স্মৃতিসভা।

৮২ বৎসর পূর্ব্বে ২৭এ সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলণ্ডের বৃষ্টল নগরে নব্যবঙ্গের জন্মদাতা মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় দেহত্যাগ করেন। তিনি তাঁহার জন্ম দ্বারা পূর্ব্ব এবং মৃত্যুদ্বারা পশ্চিমকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের সুধীসমাজ বঙ্গের এই মহাপুরুষকে বৎসর বৎসর এই দিনে শ্রদ্ধার অঞ্জলি প্রদান করেন।

গত সোমবার বেলা সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় রামমোহন লাইব্রেরী গৃহে এই মহাপুরুষের স্মৃতি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন।

রাজার স্বরচিত "ভাব সেই একে" সঙ্গীতে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সঙ্গীতান্তে পূজনীয় আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় অতি সংক্ষিপ্ত সময়োচিত প্রার্থনা করেন। অতঃপর আর একটী সঙ্গীত হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেন মহাশয় রাজার বিশেষত্ব বর্ণনা করিয়া একটি বক্তৃতা করেন। রাজার সমাধি দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ যে বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, তিনি তাহার আবেগ পূর্ণ ভাষায় উল্লেখ করিয়াছিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন।

আমরা সেই সুদীর্ঘ বক্তৃতার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করিলাম—

সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা।

আপনারা আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তার মুখে শুনেছেন যে রাজা রামমোহনের কর্ম্মজীবনের বৈচিত্র্য নানাদিকে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর জীবনের এই কর্ম্ম-বৈচিত্র্য বর্ণনায় আমি অসমর্থ। আমি কেবল তাঁর জীবনের একটি কথা আপনাদের নিকটে বলিব। এতাবৎ কাল আমরা তাঁর স্মৃতি সভায় কেউ তাঁহার রাজনীতি কেউ শিক্ষা বিস্তার কেউ সমাজ সংস্কার এইরূপে খণ্ড খণ্ড করে তাঁর জীবনের এক একটা দিক আলোচনা করেছি। এমন টুক্‌রা টুক্‌রা করে কোন মহৎ-চরিত্র আলোচনা করা আমি অন্যায় বলে মনে করি, ইহাতে সম্মান না করে অপমান করা হয়। ঠিক আসল যে শক্তিটি তাঁর জীবনে সঙ্গীতের মত বেজে উঠেছিল তার দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না। বিশেষতঃ যে খানে রাজা রাম মোহনের মহত্ব, তাঁর সেই দিকটা বাদ দিয়ে আমরা যদি তাঁকে কেউ আট আনা, কেউ বারো আনা স্বীকার করি তা'হলে তাঁর অপমানই করা হবে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁদের হয় সম্মান করে ষোল আনা স্বীকার করতে হবে, না হয় অস্বীকার ক'রে অপমানিত করতে হবে,

এর মাঝামাঝি অন্য পথ নেই। আমি মনে করি, সত্যকে আশ্রয় করে, রামমোহন তাঁর দেশবাসীর নিকটে তখন যে নিন্দা ও অসম্মান পেয়েছিলেন, সেই নিন্দা ও অপমানই তাঁর মহত্ব বিশেষভাবে প্রকাশ করে। তিনি যে নিন্দা লাভ করেছিলেন সেই নিন্দাই তাঁর গৌরবের মুকুট। লোকে গোপনে তাঁহার প্রাণবধেরও চেষ্টা করেছিল।

বৈদিক যুগে ঋষিরা এক সময়ে সূর্য্যকেই দেবতা বলে পূজা করিতেন। আবার উপনিষদে ঋষি সেই সূর্য্যকেই বলেছেন "হে সূর্য্য, তুমি তোমার আবরণ অনাবৃত কর, তোমার মধ্যে আমরা সেই জ্যোতির্ম্ময় সত্যদেবতাকে দেখি।" সেকালে যতই পূজা, হোম, ক্রিয়া, অনুষ্ঠান থাকুক না কেন, সেই সকলের আবরণ ভেদ করে ঋষিরা সত্যকে দেখেছিলেন। যে ঈশোপনিষদে ঋষি সূর্য্যকে অনাবৃত হতে আহ্বান করেছেন সেই উপনিষদেরই প্রথম শ্লোক হচ্ছে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ
জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ
কস্যস্বিদ্ধনং॥

সকলই সেই ঈশ্বরকে দিয়া আচ্ছন্ন করা, দেখ্‌তে হবে এবং তাঁর দান ভোগ করতে হবে।

রাজা রামমোহন এই এক অবিনাশীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই এককেই তিনি দেশাচার প্রভৃতির জঞ্জাল হতে অনাবৃত করে, কেবল বাঙ্গালীকে নয়, ভারতবাসীকে নয়, পৃথিবীবাসী সকলকে দেখালেন। তিনি তাঁকে জেনে প্রাচীন ঋষির মত বল্‌লেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

এই খানেই তাঁর বিশেষত্ব। তিনি সমস্ত আবরণের মধ্য হতে এককে আবিষ্কার করেছেন। তিনি একদিকে প্রাচীন ঋষি, আবার অন্যদিকে তিনি একেবারে আধুনিক, যতদূর পর্য্যন্ত আধুনিক হওয়া যায় তিনি তাই। আগে এই বিশ্বাস ছিল, এই ব্রহ্মকে সকলে জানতে পারে না। রামমোহন তাহা স্বীকার কর্‌লেন না, তিনি সকলকেই বল্লেন—"ভাব সেই একে।"

আজকার সভার এই প্রারম্ভ সঙ্গীত—"ভাব সেই একে" ইহাই রামমোহনের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত কথা।

যিনি যাহাতে বড়, তাঁকে সেই দিক দিয়ে সম্মান দেখাতে হয়। বিদ্যায় বড় যিনি, তিনি বিদ্বান বলে সম্মান পান। রামমোহনকে সেই সকল দিক দিয়া দেখলে চল্‌বে না, তিনি এককে, সত্যকে লাভ করেছেন, সেই সত্যই তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড় জিনিষ। তাঁকে স্বীকার করেই তিনি নিন্দার মুকুট উপহার পেয়েছেন।

পৃথিবীর অন্য সব মহাপুরুষের মত তিনি টাকা কড়ি, বিদ্যা, খ্যাতি কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি, তিনি তাঁর

সমস্ত জীবন দিয়ে সেই এক সত্যকেই চেয়েছিলেন।

ভীষণ মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ এক জায়গায় একটা প্রস্রবণ প্রকাশ পায়। হো'ক না সেটা মরুভূমি, তথাপি সেখানেও ধরিত্রীর বুকের ভিতরে প্রাণের রসধারা আছে। এই ধারা সর্ব্বত্রই আছে। চারিদিকের শুষ্ক নির্জ্জীব সমতল বালুর ক্ষেত্রের মধ্যে এই প্রস্রবণ একান্ত খাপছাড়া বলে মনে হবে সন্দেহ নাই। হয়তো চারিদিক বলবে, "বেশ জড় নির্জ্জীব শান্ত ছিলাম আমরা, হঠাৎ কোত্থেকে এল এই শ্যামলতা ও জলধারার কলধ্বনি।"

এই শুষ্ক নির্জ্জীব দেশে মুক্তির বাণী, ও জীবনের শ্যামলতা নিয়ে রামমোহন এসেছিলেন। আমরা জোর করে তাঁকে অস্বীকার করতে চাই কিন্তু সাধ্য কি তাঁকে অস্বীকার করি। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই তাঁর জীবনধারা দেখতে পাই। আমরা এখন ফল পাচ্ছি তাই অনায়াসে গাছের গোড়ার কথা অস্বীকার করছি। রামমোহন আমাদের কাছে আত্মার মুক্তির সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। আমরা এখন বিদেশী কলকব্জা শিখতে চাই, পশ্চিমের অনুকরণে বাইরে থেকে অপকৃষ্ট উপায়ে স্বাধীনতা চাই, সে অসম্ভব। সকল শক্তির যেখানে মধ্যবিন্দু ও প্রাণের যেখানে কেন্দ্র, সেখান থেকে আমরা জীবনধারা লাভ করতে না পারলে, আমরা বাইরের চেষ্টায় মুক্তি পাব না।

অনেকের এই ধারণা আছে পশ্চিমে আধ্যাত্মিকতা নেই, তারা বস্তুতেই বড় হয়ে উঠেছে। আমি তা স্বীকার করি না। আধ্যাত্মিকতায় বড় না হয়ে মানুষ কিছুতেই বড় হতে পারে না। তাদের সেবা, তাদের প্রেম, তাদের ত্যাগের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা একথা কিছুতেই বলতে পারেন না যে পশ্চিমে আধ্যাত্মিকতা নেই।

রামমোহনকে সম্মান করতে হলে তাঁর জীবনের এই শ্রেষ্ঠ সত্যকে বরণ করতে হবে।

তাঁর জীবনের এই আসল কথাটিই আমার বক্তব্য। আর কিছু বলার সাধ্য আমার নেই।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়। উদ্ধৃত

জাপানে স্ত্রীশিক্ষা ও আমাদের কর্ত্তব্য।

আজকার সম্মিলনে কেহ বা আমার পূজনীয় কেহ বা সমবয়স্ক—যাহাদের সহিত একত্রে ব্রাহ্মসমাজের উদার আদর্শে বর্দ্ধিত হইয়াছি—কিন্তু অধিকাংশই আমার কনিষ্ঠ—তাঁহাদেরই বিশেষভাবে আজ সম্বোধন করিতেছি। আমি বক্তা নহি। এ পর্য্যন্ত কোথাও প্রকাশ্য সভায় কিছু বলি নাই—তবে আজ কেন

সম্মত হইলাম। দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া আমার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহা আপনাদের নিকট প্রকাশ না করিলে আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে, তাই স্বাভাবিক সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া আজ দু চারটী কথা বলিব। যদি আমার হৃদয়ের আশা ও উৎসাহের কণামাত্র আপনাদের নিকট প্রকাশ করিতে পারি, তাহা হইলে সুখী হইব।

আমারা যে জিনিস প্রত্যহ দেখি এবং যাহা অনায়াসে পাই, তাহার মূল্য বুঝি না, এমন কি তাহা অবজ্ঞার চক্ষে দেখি। আবার এক সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে কাজ করিতে করিতে আমাদের চক্ষে অভাবগুলিই প্রতিনিয়ত প্রতিভাত হয়, আমরা বড় করিয়া দেখিবার শক্তি হারাই।

এজন্যই আমাদের মাঝে মাঝে দেশভ্রমণে বাহির হওয়া উচিত মনে করি। প্রবাসে গেলেই আমরা প্রতিদিনের বিরক্তিকর ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি ভুলিয়া যাই, যেগুলি আমাদের অগোচরে প্রচ্ছন্ন ভাবে আমাদের আনন্দ দিয়াছে, সেগুলিই মনে আসে। দেশের প্রতি ভালবাসা জাগিয়া উঠে এবং দেশের সামান্য জিনিষের সৌন্দর্য্য ও মহিমা দেখিতে পাই। তাহা ছাড়া নূতন স্থানে আমাদের আত্মনির্ভর ও আত্মশক্তি বাড়িয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশের রীতি নীতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান পুস্তক হইতেই—পুস্তকে আমরা কেবল আদর্শটাই জানি এবং সেই আদর্শের সহিত আমাদের দুর্ব্বলতার তুলনা করি। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে ভ্রমণ করিয়া তাহাদেরও নৈনন্দিন জীবন দেখিলে তখনই আমরা প্রকৃত বুঝিতে পারি কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, কোনটাতে আমরা ছোট, কোনটাতে আমরা বড়। বিদেশে সব চেয়ে আমাদের মনে হয়, সব দেশেই স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইতেছে, আমাদের দেশই কেবল সকলের পশ্চাতে পড়িয়া আছে।

পাশ্চাত্য দেশে যাওয়ার আর এক সুফল এই যে, সেখানে আমরা বুঝিতে পারি যে, আমরা এক দেশের সন্তান। সেখানে ভারত সন্তানের মধ্যে হিন্দু মুসলমান নাই, বাঙ্গালী পাঞ্জাবী নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই, সকলেই ভারতের—ভারতবাসীরা আমেরিকাতে হিন্দু অথবা হিন্দুস্থানী নামে খ্যাত। ভারতবর্ষে যাহা সাধন কষ্টসাধ্য, বিদেশে তাহা অনায়াসে সাধিত হইতেছে। বিদেশে যাওয়ামাত্র সকলে ভাই ভাই বলিয়া পরস্পরকে চিনেন—এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ৮।১০টী প্রদেশে গিয়াছি, প্রত্যেক স্থানেই এই একতার ভাব দেখিয়াছি—এক স্থানে ছাত্রবাসে নিমন্ত্রিত হইয়া দেখিলাম ছাত্রটী রন্ধন ও পরিবেশন করিলেন, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ ও বাঙ্গালী কায়স্থ সকলে এক সঙ্গে বসিয়া আহার করিলেন, তাঁহারা সকলেই একতাসূত্রে আবদ্ধ।

আমেরিকাতে অধিকাংশ ছাত্রই

অর্থোপার্জ্জন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন। ইহা যে কতদূর শ্রমসাধ্য তাহা আপনারা জানেন। আমাদের দেশের কত দরিদ্র ছাত্র পাচকের কার্য্য করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছেন। আমেরিকাতে এই সব ছাত্রদের মধ্যে পরস্পরকে সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি—ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় যে সব ছাত্র এক নগরে অর্থোপার্জ্জন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা যে সব সময়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা এক সাধারণ ফণ্ড করিয়া যিনি যখন যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহা ভাগ করিয়া একে অন্যকে সাহায্য করেন। কঠিন পরিশ্রমে নিযুক্ত কপর্দ্দকশূন্য এই যুবকদের যেখানেই দেখিয়াছি, কাহারও মুখে নিরাশা বা ম্লানভাব দেখি নাই। আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহে তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ—সকলেরই উদ্দেশ্য জ্ঞানরত্ন আহরণ করিয়া উন্নতি করা। সকলেই দিন গণিতেছেন, কবে কর্ম্মক্ষম হইয়া দেশে ফিরিবেন।

আমাদের ভ্রমণকালে আমেরিকা, চীন, জাপান যেখানেই গিয়াছি, ভারতীয় ছাত্র বা ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে।

পৃথিবীতে এমন স্থান নাই যেখানে ভারতবাসী কোন না কোন কার্য্যোপলক্ষে বাস না করিতেছেন এবং আমরা যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে তাঁহাদের কৃতিত্ব দ্বারা তাঁহারা ভারতের গৌরবই বৃদ্ধি করিতেছেন—ইহা কি কম আনন্দের বিষয়?

আমরা যেখানে গিয়াছি, ভারতীয় ভদ্রলোক ও যুবকদের আতিথ্য ও সেবা পাইয়া ধন্য হইয়াছি। ধন্য হইয়াছি এজন্য যে ভারতবাসীর এখন আত্মমর্য্যাদা বোধ ও আত্মজ্ঞান হইয়াছে—এক সময় ছিল যখন আমরা পরস্পরকে হিংসা করিতাম—এখন আর সে দিন নাই, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমাদের সেবা ও যত্ন যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারা মাতৃ-ভূমির সেবা করিতেছেন, এইরূপ অনুভব করিয়াছি। যাঁহাদের জীবনে কখন দেখি নাই অথবা আর কখন দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই, কি ভারতে কি বিদেশে সেই সকল ভারতবাসী প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতার জন্য অপেক্ষা না করিয়া আমাদের অতি আত্মীয়ভাবে সেবা ও যত্ন করিয়াছেন—ঘরের লোকের মতন ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে, আমাদের মধ্যে আত্মজ্ঞানের উদয় হইয়াছে।

আজ আপনাদের নিকট নারীজাতির পক্ষ হইতে আমার একটী নিবেদন আছে।

এ সম্মিলনে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিছু বলিবার দরকার নাই, কিন্তু ভ্রমণকালে বিভিন্ন দেশের নারীজাতির অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা ব্যতীত কোন দেশের উন্নতি হইতে পারে না। এ কথা

আপনারা সকলেই জানেন, ইহা কিছু নূতন কথা নহে। কিন্তু আপনারা যে জানিয়াও জানিতেছেন না—আপনারা যদি সত্যই তাহা বিশ্বাস করিতেন, তবে কি এরূপ নিশ্চেষ্ট থাকিতেন? কেবল স্ব স্ব কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলেই কি আপনাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল?

দেশময় নারীজাতি অশিক্ষিত রহিয়াছে, অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া রহিয়াছে, তাহার জন্য আমরা কি করিতেছি? স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ পড়িয়াছি, অনেক কবিতা দেখিয়াছি, কিন্তু কায কি হইতেছে?

আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধেই বা ক'জন চিন্তা করিতেছেন! আমাদের ছাত্রদের শিক্ষা-প্রণালী ইংলণ্ডের শিক্ষাপ্রণালী হইতে অনেক পুরাতন, আবার আমাদের স্ত্রী-শিক্ষা প্রণালীও তাহারই অনুকরণে গঠিত। আমাদের দেশের স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। আমরা যে শিক্ষা বিষয়ে একেবারে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিব তাহার কোন কারণ দেখি না। আমি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা চাই, কিন্তু যে শিক্ষাতে ভারতনারী তাঁহার নম্রতা, বিনয় ও কোমলতা হারাইবেন সে শিক্ষা চাই না। আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে হইবে, সঙ্কীর্ণতা দূর করিতে হইবে, প্রাদেশিকতা ছাড়াইয়া আমাদের দেশকেও বড় করিয়া দেখিতে হইবে এবং তদর্থে নারী-জাতিকে প্রকৃতরূপে শিক্ষা দিতে হইবে।

এখন আমরা ছোটখাট বিষয় লইয়া দিন কাটাইতেছি, কিন্তু এমন দিন ছিল, যখন আমাদের নারীর জ্ঞান আহরণ করিয়া জগতের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছিল। সে সব দিনের কথা স্মরণ করিয়া আমাদের এই সঙ্কল্প হউক যে ভারতে আবার সে দিন আনিতে হইবে, এবং আপনারা আমাদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হউন। আমাদের দেশে নারীশিক্ষা বিস্তারের মূলে কয়েকটী উৎসাহী যুবক ছিলেন জাপানে স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাস পড়িলেও তাহাই দেখি। জাপানের যখন প্রথম চেতনা হইল তখন সকলেই পাশ্চাত্য অনুকরণে প্রবৃত্ত ছিলেন। এই পাশ্চাত্য অনুকরণ যাহাতে বন্ধ হয়, যাহাতে জাপানী আচার ব্যবহার সুরক্ষিত হয়, জাপানী স্ত্রীশিক্ষা সেই উদ্দেশ্যে প্রচলিত হইল। জাপানে কোনও দিন অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল না, কিন্তু তাহাদের সামাজিক প্রণালী ইউ-রোপীয় নহে। যদিও জাপানী নারী অসঙ্কোচে রাস্তায় বাহির হন, কিন্তু পুরুষদের সহিত তাঁহাদের অবাধে মেশামিশী নাই। স্কুলের বালিকা, বিবাহিত ও অবিবাহিত নারীগণ, ট্রামে, গাড়ীতে পুরুষদের সঙ্গে যাতায়াত করেন বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদাই একটু ব্যবধান থাকে। কয়েকটী জাপানী যুবক, ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁহারা কি করিয়া জাপানে উচ্চশিক্ষার প্রচলন করিবেন, রাত্রিদিন

এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা এক এক নগরে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নিজেরাই তাহাতে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সকল বিদ্যালয় যখন দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তখন তাহার ভার যোগ্য ব্যক্তির উপর দিয়া তাঁহারা অন্য নগরে বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এইরূপে তাঁহাদের বিদ্যালয় সমূহ দেশের গণ্যমান্য পদস্থ ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, এবং তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা বুঝিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উৎসাহে ও অর্থে বর্ত্তমান স্ত্রীবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আমি সেটী দেখিতে গিয়াছিলাম। টোকিও নগরের প্রান্তে একটী ছোটখাট গ্রামের মতন ইহার বিস্তৃতি। প্রাথমিক হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। লেখাপড়ার সহিত গৃহস্থালী, এমন কি আদব কায়দা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহাতে কেবল যে সুকুমার বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় এমন নহে, গো-পালন, পশুপক্ষী পালন, কৃষিকার্য্য শিক্ষা দেওয়াও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত। জাপানীরা তাহাদের দেশের উপযোগী শিক্ষা-প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়াছে। তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের আড়ম্বরহীনতা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। তাহারা নিজেদের আবশ্যকতা অনুসারে গৃহকার্য্য ও জীবন-ধারণ-প্রণালী গঠন করিয়া লইয়াছে। আর আমাদের জীবনধারণ প্রণালী দিন দিন আরও জটিল ও বিলাসিতাপূর্ণ হইতেছে। এই বিলাসিতা হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে নারীর উচ্চশিক্ষা ছাড়া আর উপায় নাই।

জাপান দেশ সব দেশ হইতে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। দেশটী যেন ছবির মতন গোছান। বাড়ী, ঘর, রাস্তা, গলি কোথাও আমি কোন অপরিষ্কার জিনিষ দেখি নাই।

জাপান তাহার দৈনন্দিন জীবনের সকল কার্য্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আধুনিক ও নব আবিষ্কৃত সব নিয়ম পালন করিতেছে কন? স্ত্রীশিক্ষার ফলে। প্রাচ্য প্রতীচ্য সব দেশেই স্ত্রীশিক্ষার বিস্তৃতি হইতেছে, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাদের দেশেই কি কেবল পিছাতে রহিবে? আমাদের নিজেদের চেষ্টা করিতে হইবে। কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না— আমাদের মধ্যে চিন্তাশীল ও মেধাবী ব্যক্তিগণ ইউরোপে, আমেরিকাতে ও জাপানে গিয়া পাশ্চাত্য দেশের স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী আলোচনা করিয়া আমাদের দেশের জন্য কিরূপ শিক্ষা চাই, তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন।

আমি যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে আমাদের দেশের স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী প্রাণহীন ও শুষ্ক বলিয়া মনে হয়। আমরা নারীদিগকে এরূপ কতকগুলি বিষয় শিখাইতেছি, তাহার সহিত জীবনের কোন সম্বন্ধ নাই। জাপানে দেখিলাম নারীগণ বিবাহিতা হইয়াও কার্য্য করে! ইহা কিরূপে সম্ভব? আমাদের শিক্ষিত বালিকাদের

বিবাহ হইলে তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্র হইতে অদৃশ্য হইয়া পড়ে তাহাদের আর লেখা-পড়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না। তাহার কারণ আমাদের সংসার গঠন সরল ও সহজ নহে। যত দেশে বেড়াইলাম, জাপান পর্য্যন্ত সকল স্থানেই গৃহিণীরা গৃহকার্য্য ও সন্তান পালন প্রভৃতি করিয়া অবসর মত লেখাপড়ার চর্চ্চা ও সামাজিক কর্ত্তব্য সবই পালন করেন—কেবল আমাদের দেশেই আমরা দিনরাত আহারাদি গৃহকার্য্য লইয়া বিব্রত থাকি। ইহার কারণ বাহির করিয়া তাহার প্রতিকার করা আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। জাপানে যে সকল মহিলা আমেরিকা ও জর্ম্মাণী হইতে শিক্ষিতা হইয়া শিক্ষয়িত্রীর কায করিতেছেন, তাঁহাদের বেতন ৭৫্ টাকা মাত্র, ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর পাইলাম যে আমাদের গরীব দেশ, তাহাতে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে, সে জন্য আমরা শিক্ষা প্রচার ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছি। ৫০ বৎসরেরও কম হইবে জাপানে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, তাহার ফলে এইরূপ নারী-চরিত্র গঠিত হইয়াছে, আর আমাদের মধ্যে ক'জনের কাছে এইরূপ কথা শুনিতে পাই? আমরা শিক্ষালাভ করিয়া নিজের সুখসচ্ছন্দতা ও সংসার লইয়া আছি—ক'জনের বা দেশের কথা মনে হয়—কয়জন শিক্ষা প্রচার—ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি? যত দিন এই ভাবে আমাদের নারীগণ অনুপ্রাণিত না হইবেন, ততদিন শিক্ষা বিফল হইবে। আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে সত্যপথ অনুসরণ করিলে অবিলম্বে আমাদের মধ্যে এই ভাব প্রবেশ করিবে। সে জন্য আমাদের ব্রতধারিণী ২৷১টি মহিলাকে ইউরোপে পাঠাইয়া শিক্ষা প্রণালী শিখাইয়া আনিতে হইবে। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন পাশ্চাত্যদেশ হইতে আমাদের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য ২৷১টি মহিলাকে আনা আবশ্যক। ইহাতে কয়েকটী বিপদ আছে। পাশ্চাত্য রমণীর ব্যক্তিত্ব এত অধিক যে সচরাচর তাঁহাদের সহিত আমাদের মিলন হয় না এবং তাঁহারা আমাদের উপর আধিপত্য করিতে চান।

ভগিনী নিবেদিতার ন্যায় স্বার্থশূন্য শিক্ষা-ব্রতধারিণী নারী সব সময়ে সব দেশে দেখা যায় না। আমার সৌভাগ্যবশতঃ খুঁজিতে খুঁজিতে দুইটি উদার হৃদয়া নারীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, তাঁহারা এদেশে আসিয়া আমাদেরই অধীনে থাকিয়া আমাদের কার্য্যে সহায়তা করিতে প্রস্তুত, কিন্তু ইহা অর্থ সাপেক্ষ।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমাদের দেশে শিক্ষার কোন বন্দোবস্তই ছিল না, তখন একটী দরিদ্র অজ্ঞাত পণ্ডিতের প্রাণ নারীজাতির দুঃখে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তিনি নারীজাতির উন্নতিসাধন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন—বাধা বিপত্তি না মানিয়া প্রবল উৎসাহে তিনি নারীজাতির উন্নতির সহায় হইয়া-

ছিলেন। সেই অবলা-বান্ধব কর্ম্মবীরের নাম কাহারও অবিদিত নাই। আজি তবে কি এই বঙ্গভূমিতে শত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবির্ভাব অসম্ভব।৹

শ্রীঅবলা বসু।

ইষ্টলিন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভ্রূশভঙ্গ।

লেডী ইসাবেলের শকট বরাবর মিসেস লেভিসনের বাড়ী আসিয়া পৌছিল। এখন মিসেস্ লেভিসনের একটু পরিচয় দিই। মিসেস্ লেভিসনের বয়স প্রায় ৮০র কাছাকাছি, এবং তাঁহার স্বভাবটী অত্যন্ত খিট্‌খিটে ও কঠোর। মিসেস ভেন যেমন তাঁহাকে কষ্ট দিতেন ও কর্কশ ব্যবহার করিতেন তিনিও অনেকটা সেইরূপ ব্যবহার করিতেন।

ইসাবেল যখন গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল তখন বৃদ্ধা লেভিসন অত্যন্ত অধীর ভাবে মাথার টুপী খুলিয়া, গাউন টানিয়া, গৃহের চারিদিকে চাহিয়া তাঁহার জন্ত রক্ষিত আহারীয় দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অত্যন্ত বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ করিতেছিলেন। "আমি অত্যন্ত ভীত হইতেছি, আমার বিলম্বে আসিয়া পৌছানর জন্য," এই বলিতে বলিতে লেডী ইজাবেল মিসেস্ লেভিসনের দিকে অগ্রসর হইল। "কিন্তু কি করিব বাবা আজ একজন ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণে আহার করিতে বলিয়াছিলেন সেই কারণে আমাদের আহারের বিলম্ব হইয়া যাইল।"

বৃদ্ধা একটু কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন "যে সময় তোমার আসিবার কথা ছিল তুমি তাহার ২৫ মিনিট বিলম্বে আসিয়াছ, যা হউক এগময়—এখন আমার চা আনিতে বল"।

মিসেস্ ভেন চা আনিতে আদেশ করিলেন। মিসেস্ ভেন দেখিতে ছোট খাট মানুষটী, বয়স ২৬ বৎসর, মুখখানি সাধারণের ন্যায় কিন্তু গঠনটী অতি সুন্দর। তিনি ভয়ানক গর্ব্বিতা স্ত্রীলোক, তিনি মাতৃহীনা। মিসেস্ লেভিসন তাঁর মাতামহী, এবং মি বেমণ্ড ভেন, তাঁহার স্বামী। তিনি আর্ল অফ্ মাউণ্ট সভারিণের দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতা।

মিসেস্ লেভিসন জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে ইসাবেল্, তুমি কি তোমার গায়ের কাপড় খানি খুলিয়া রাখিবে না? তোমাদের এই নিত্য নূতন ফ্যাসানের পোষাকের নাম কি তা আমি জানি না।"

৹ এই আখ্যায়িকা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত ছাত্র সমাজ কর্ত্তৃক সর্ব্বোত্তম সভায় পঠিত।

ইসাবেল গাত্রাবরণ খানি খুলিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিল।

"দিদি মা এখনও চা প্রস্তুত হয় নাই!" মিসেস্ ভেন আশ্চর্য্য হইয়া এই কথা বলিলেন, এমন সময় একজন ভৃত্য ট্রে এবং রূপার চা পানের পাত্র সকল লইয়া প্রবেশ করিল। "তুমি কখনও এ ঘরে চা প্রস্তুত করিও না!"

মিসেস্ লেভিসন বলিলেন, "কোথায় তবে চা প্রস্তুত হইবে?"

মিসেস্ ভেন বলিলেন "একেবারে প্রস্তুত করিয়া আনিলেই ত হইত, এখানে আবার কষ্ট করে চা প্রস্তুত করিতে আমি ভাল বাসি না।"

বৃদ্ধা বলিলেন "যা বলিয়াছ! ঠাণ্ডা দুগ্ধের ন্যায় বিস্বাদ হইয়া যাউক! এমমা—তুমি সকল সময়ই ভয়ানক কুঁড়ে।"

দিদিমার পশ্চাতে ইসাবেলের প্রতি ঘৃণা পূর্ণ বিদ্বেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া, মিসেস্ ভেন বলিলেন "কে তোমার জন্য সকল সময়ে চা প্রস্তুত করিবে?" কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ইসাবেলের প্রতি পতিত হওয়ায় ইসাবেলের গণ্ডস্থল লজ্জায় লাল হইয়া যাইল। সে ইহাদের আচরণ ভাল, না তাহার পিতার অস্তকার অতিথির আচরণ ভাল তাহা বুঝিতে পরিতেছিল না, কিন্তু তাহার মন এই বৃদ্ধাদের চিন্তা ত্যাগ করিতে চাহিতেছিল।

"হ্যারিট এস আমার জন্য ইহা প্রস্তুত কর," মিসেস্ লেভিসন বলিলেন, "হাঁ, বাঁস, আমার সঙ্গে প্রস্তুত কর, আমি এম্মা এমমা তুমি কি বল?"

"দিদিমা তোমার যেমন ইচ্ছা সেইরূপ কর।"

"এমমা তোমার হাতের কনুয়ের কাছে চা'র পাত্র রহিয়াছে টানিয়া লইয়া প্রস্তুত করিতে আরম্ভ কর। যদি তুমি আজ রাত্রিতে চা খাইতে ইচ্ছা কর, ভালর ভালয় এই বেলা প্রস্তুত করিয়া ফেল", মিসেস্ লেভিসন বলিলেন।

পাছে হাতের দস্তানা খুলিতে হয় এই ভয়ে মিসেস্ ভেন বক্ বক্ করিতে করিতে বলিলেন "আমি চা প্রস্তুত করিতে জানি না।

উৎসাহের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া ইস বেল বলিল, "আমি প্রস্তুত করিব, আমি বাটীতে বাবার জন্য নিজ হাতে চা প্রস্তুত করি।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "কর মা," "তুমি উহা হইতে দশগুণ ভাল প্রস্তুত করিবে।"

ইসাবেল আনন্দে হাসিয়া উঠিল, এবং তাহার হস্তের দস্তানা টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়া চা প্রস্তুত করিতে বসিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একজন সুন্দর যুবক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই যুবকটী দেখিতে অতি সুন্দর। কৃষ্ণতার তাহার চক্ষু, কাক বিনিন্দিত কেশ কলাপ, শুভ্র দন্তপাতি ও সুগঠিত দেহ। কিন্তু তীক্ষ্ণদর্শী কেহ ইহাঁকে মোটেই পছন্দ করিতেন না। ইনি গৃহকর্ত্রী বৃদ্ধা মিসেস্ লেভিসনের পৌত্র, এবং মিসেস্ ভেনের মাতুল পুত্র। (ক্রমশঃ)

একাদশী।

স্থানটা সমুদ্রের ধারে—ওয়ালটেয়ার। পূর্ব্বদিন সারারাত জাগিয়া—নাচ তামাসা দেখিয়া, একাদশী সমুদ্রের তীরে বালীর উপর একটা পাথরে মাথা রাখিয়া অগাধে ঘুমাইতেছে; সময় তখন মধ্যাহ্ন অতীত। স্নানার্থির বেশে একদল মেম ও সাহেব—ছোট বড় ছেলে মেয়ে সঙ্গে, ললিত-চপল হাসির লহরী তুলিয়া ছুটাছুটি লাফালাফি করিতে করিতে নিদ্রিত একাদশীর পাশ দিয়া, স্নানের জন্য সমুদ্রে গিয়া নামিল।

বহুক্ষণ গাঢ় নিদ্রার পর একাদশীর ঘুমটা তখন পাতলা হইয়া আসিয়াছিল, কাযেই স্নানার্থিগণের কৌতুক-উল্লাসিত সেই মধুর হাস্য ঝঙ্কারে নিজের আবেশ জড়ভাটা রাখিয়া, নিদ্রা মহাশয় নিঃশব্দে পিটটান দিলেন, একাদশী উঠিয়া বসিল।

তাহার উষ্ণ মস্তিষ্কের ভিতর তখনও গত রাত্রির সেই নাচ তামাসার গোলমালের জের চলিতেছিল, সুতরাং প্রথমটা নিদ্রোত্থিতের বারম্বার বিস্ফারিত-চক্ষে এদিক ওদিক চাহিয়া অবসাদ ঘোর কাটাইবার চেষ্টা করিল, চারিদিকের দৃশ্যটা ভাল বোধগম্য হইল না, মনে হইল রঙ্গভূমিতে এক দল সং আসিল বুঝি!—হাই তুলিয়া গা ভাঙ্গিয়া, চোখ রগড়াইয়া ভাল করিয়া চাহিল,—নাঃ সং নয় সমুদ্র বটে!

তাইত—এত বেলা পর্য্যন্ত সে এখানে ঘুমাইতেছে!

ধড় ফড় করিয়া একাদশী উঠিয়া পড়িল। কোমর হইতে গামছা খুলিয়া, তাড়াতাড়ি সমুদ্রের জলে নামিয়া, গা, হাত, পা, মাজিতে লাগিল, অনেক বেলা পর্য্যন্ত রৌদ্রে পড়িয়া ঘুমানয় তাহার কণ্ঠা পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছে, রাত জাগিয়া তামাসা দেখা কি নিগ্রহ!

ওদিকে সেই গেঞ্জি পরা, পায়জামা আঁটা সাহেব মেমের দল, সমুদ্রের বেলার ঢেউয়ে নাকানি চুপানি খাইয়া, ঢেউয়ের তোড়ে, ছিটকাইয়া খেধা খোপা ছড়াইয়া পড়িয়াছে,—ছেলেরা শুদ্ধ ছত্র ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। সমুদ্রের এক একটা ঢেউ দুরন্ত আবেগে উছলিয়া আসিতেছে, আর উলট্ পালট্ পর্য্যদস্ত স্নানার্থিবৃন্দের উচ্ছ্বসিত তরল হাসির ঢেউ বায়ু স্তর ছাপাইয়া উঠিতেছে! কি আমোদ! কি আমোদ!

তাড়াতাড়ি গামছা কাচিয়া, গোটা দুই ঢেউ খাইয়া, একাদশী জলে দাঁড়াইয়াই মাথা মুছিতে লাগিল, উষ্ণ মস্তিষ্কের রক্ত ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক নূতন ভাবনা জুটিল এত বেলায় বাড়ী যাইলে দাদা কি বলিবে?

যাহা বলিবে তাহাত স্পষ্ট পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে, অতএব সেটুকু বরদাস্ত করা ভিন্ন উপায় নাই, সুতরাং সেই জন্যে মনটা পূর্ব্ব হইতে চাঙ্গা করিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কায!—

একাদশী গামছা পরিয়া জলে খেলাইয়া খেলাইয়া কাপড় খানা কাচিতেছে, এমন সময় একটা মস্ত ঢেউ আসিল, একাদশী হেঁট হইয়াছিল,—যেমন তাড়াতাড়ি সোজা হইয়া দাঁড়াইবে—অমনি পশ্চাৎ হইতে ছুই শুভ্র কোমল ক্ষুদ্র বাহু আসিয়া, তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিল! সঙ্গে সঙ্গে কচি কণ্ঠ নিঃসৃত—বিকৃত উচ্চারণে ব্যগ্র মধুর অনুরোধ "ওগো আমায় ঢেউ খাওয়াও না!"

বিস্মিত একাদশী ফিরিয়া চাহিল, সাত আট বৎসরের একটী সাহেব সন্তান!—কি সুন্দর ছেলে! স্নিগ্ধ প্রীতিতে একাদশীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!

উন্মত্ত সিন্ধুর তটাভিহত ঢেউ আবার নামিয়া চলিল, পায়ের তলা হইতে বালী গুলো পর্য্যন্ত সরাইয়া!—ক্ষিপ্র হস্তে ছেলেটীকে আটকাইয়া ধরিয়া একাদশী ঢেউয়ের প্রখর বেগ ঠেলিয়া, লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া তীরে উঠিল, জলসিক্ত কাপড় খানা ঠিক্‌ঠাক করিয়া গুটাইয়া গুটাইয়া কোমরে কসিল।

ফুটফুটে সুন্দর শীর্ণ কলেবর ছেলেটী মুখ চোখের লবণাক্ত জল, হস্ত দ্বারা মুছিতে মুছিতে স্নিগ্ধোজ্জ্বল নীল চোখ দুটী তুলিয়া ব্যগ্র কৌতুকে, একাদশীকে দেখিতে লাগিল,—অদূরে তাহার সঙ্গীরা জলের ভিতর লাফালাফি করিয়া উচ্চ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হাসিতেছে,—হা-হা-হো-হা হাঃ!

বেলা ঢের হইয়াছে, একাদশী এখনো কিছু খাইতে পায় নাই, তবু এই অপরিচিত ছোট বালকটীর অনুরোধ এড়াইতে পারিল না, বুঝি এড়াইবার ইচ্ছাও ছিল না। ওই ছোট ছেলেটীর জন্য সে আবার জলে নামিতে প্রস্তুত হইল, এবার নামিলে যে শীঘ্র উঠা হইবে না, তাহা সে বেশ বুঝিল, তথাপি কিছুমাত্র দমিতে রাজী হইল না। এই কোমল কচি ছেলেটীকে খুসী করিবার জন্য সে কোন্ মুখে নিজে একটু ছুর্ভোগ স্বীকার করিতে পিছাইবে? সে কি এমনি হৃদয়হীন—না!

ভাইত যাহা বলিবার তাহা বলিবেই, না হয় আর একটু বেশী করিয়া বকিবে, তা বলিয়া—নাঃ।

একাদশীর মুখে নির্ভীক উৎসাহের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, কোমরে গামছা বাঁধিয়া প্রিয় দর্শন বালকটীকে পিঠে লইয়া, সে ঝপাৎ করিয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল,—"চল সাহেব সাঁতার দিয়ে তোমায় ঢেউ খাইয়ে আনি!"

ছোট বালকের স্ফুর্ত্তি দেখে কে! এমন করিয়া এ পর্য্যন্ত কেউ তাহাকে ঢেউ খাওয়াইতে পারে নাই! আহা এই লোকটা কি ভাল! কি অদ্ভুত ইহার সাহস!—উল্লাস আবেগে বালক প্রাণপণে একাদশীকে আঁকড়াইয়া ধরিল!

ডিগ্‌বাজী ও সাঁতারের নানাবিধ কসরতের সহিত প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া, জলরাশির সহিত ঘোরতর কুস্তি করিয়া ছেলেটীকে পিঠে লইয়া একাদশী সাঁতার কাটিয়া বেড়াইল! তাহার পর সাহেব গোষ্ঠীর সকলকে একে একে তীরে উঠিতে

দেখিয়া একাদশীও তীরে উঠিল, ছেলে-টীকে পিঠ হইতে নামাইয়া দিয়া নিজের কাপড় গামছা নিঙড়াইয়া পরিতে লাগিল।

শীস্ দিয়া লাফাইতে লাফাইতে বালক আত্মীয়দের দিকে ছুটিল "বাবা, বাবা, খুব মজা হয়েছে, আমি এক অপরিচিত বন্ধু পেয়েছি!"

পিতা সবে জল হইতে উঠিয়া হাঁটুর পাজামা গুটাইতে ছিলেন, অন্যমনে বলিলেন "কি হয়েছে ফ্লুরিশ, কি পেয়েছ?"

"বন্ধু বাবা, অপরিচিত বন্ধু, ভারি ভাল!"

বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাহার দিদি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন "কোথায়?"

"ঐ যে ঐ কাপড় পরছে!"

"আরে বাঃ! ও আমাদের মেহের আলী নয়? আমরা মনে করিছিলুম তুমি বুঝি মেহের আলীর পিঠে আছ, ও কে?

"ডেকে আন দেখি—"

আচ্ছা আনছি," বালক সোৎসাহে ছুটিল! গামছা মাথায় জড়াইয়া একাদশী তখন ঘর মুখো হইবার উদ্যোগ করিতেছে—এমন সময় ফ্লুরিশ গিয়া একেবারে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, আগ্রহান্বিত কণ্ঠে ডাকিল "আরে এস এস, তোমায় আমার বাবা ডাকছেন!"

কি বিপদ! আবার ডাক!—মিনতির স্বরে একাদশী বলিল "কাল হবে সাহেব আজ ঢের বেলা হয়েছে, আর বেশী দেরী হলে বাড়ীতে বকবে!"

"তোমায় বকবে? চোখ দুটা যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া, অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বালক বলিল "তোমায় বকবে?"

যেন একাদশীকে তিরস্কার করিতে পারে এমন লোক পৃথিবীতে থাকাটা ভারি অসম্ভব!

একাদশী মৃদু হাসিল—"চল সাহেব বেলা তো হয়েছে, আর একটু হোক্, চল দেখা করে আসি।"

"এস এস"—খুব ব্যগ্রভাবে তাহার হাত ধরিয়া ছেলেটী টানিয়া লইয়া চলিল দলবলের কাছাকাছি হইয়া একেবারে উচ্চ কণ্ঠে অভিযোগ ঘোষণা করিল, "বাবা দেরি করে গেলে বন্ধুকে বাড়ীতে বকবে। শীঘ্রী ছেড়ে দিও।"

ছেলেটীর অযাচিত ওকালতীতে একাদশী ভারি লজ্জায় পড়িয়া গেল, তাড়াতাড়ি আরক্ত মুখে সাহেবকে অভিবাদন করিয়া, ভিজা গামছা খানা গায়ে জড়াইয়া সসঙ্কোচে এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব দেখিলেন পুত্রের বন্ধু এক ষোল সতের বছরের তরুণ বালক, তাহার রংটী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখখানি বেশ সুশ্রী, চোখ দুটী স্বচ্ছ সরলতায় গঠিত, মোটের উপর ছেলেটী বেশ কমনীয় বটে! হটাৎ দেখিলেই যেন ছেলেটীর উপর ভারি মমতার উদ্রেক হয়, সাহেব স্নেহময় স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি বাছা?"

"একাদশী"

"কি জাত"

মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ"

তোমার বাপ মা কে আছে ?

"কেউ নাই সাহেব, শুধু ভাই আছেন"

উপর্য্যুপরি প্রশ্ন করিয়া সাহেব জানিলেন তাহাদের বাড়ী এখান হইতে আধ ক্রোশ তফাতে, তাহার দাদার এক দোকান আছে, সেই দোকানেই সে কাজ করে, লেখা পড়া সামান্তই জানে, তাহার এখনও বিবাহ হয় নাই।

"বেশ ঐ দেখ আমার হল্‌দে রংএর কুঠী, আজ বৈকালে ঐ খানে আমার সঙ্গে দেখা কোরো, বুঝলে ?"

"বহুত আচ্ছা সাহেব।"

(২)

দিন পনের পরে—সাহেবদের অনেক জেদাজেদী ও একাদশীর আগ্রহাতিশয্যে, অবশেষে বাধ্য হইয়া একাদশীর দাদা, ভাইকে সাহেববাড়ী চাকরী করিতে দিতে সম্মত হইল।

সিদ্ধ-মনোরথ একাদশী প্রফুল্ল মুখে আসিয়া কাযে লাগিল, কাজ কেবল সাহেবের ছোট ছেলে রোগগ্রস্ত ফ্লরিণের সাহচর্য্য। ফ্লরিণকে লইয়া চারিদিকে বেড়ান, নানা উপায়ে তাহাকে খুসী রাখাই, একাদশীর কায,—অথবা রীতিমত খেলাও বলা যাইতে পারে!

ফ্লরিণ যক্ষ্মাকাশ রোগগ্রস্ত, তাহাকে বায়ু পরিবর্ত্তন করাইবার জন্যই সাহেব পরিবার এ অঞ্চলে আসিয়াছেন। সাহেব বঙ্গ দেশের কোন উচ্চ পদস্থ রাজ কর্ম্মচারী, আপাতত ছুটিতে আছেন।

দুষিত রোগ বলিয়া পিতামাতা চিকিৎসকের মতানুসারে ফ্লরিণকে একাকী স্বতন্ত্র কক্ষে নিদ্রা যাইতে দিতেন, এতদিন পর্য্যন্ত বালক এ নিয়ম নির্ব্বিবাদে পালন করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এত দিনের পর একাদশীকে পাইয়া তাহার মত বিগ্‌ড়াইয়া গেল, বাড়ীর লোকে ব্যবস্থা করিল ফ্লরিণের শয়ন কক্ষের পাশের ঘরে একাদশী শুইবে, কিন্তু একাদশী ও ফ্লরিণ গোপনে যড়যন্ত্র করিয়া সে নিয়ম একেবারে উল্টাইয়া ফেলিল।

সকলের সংসর্গ হইতে ফ্লরিণকে যে একটু স্বতন্ত্র রাখা হয়, এটা একাদশীর নিকট অমার্জ্জনীয় অন্যায়! কেন রে বাপু, এতটুকু কোমল সোণার শিশু, সে কি এমন গুরুতর অপরাধ করিয়াছে যে তাহাকে এমন নিদারুণ শাস্তিভোগ করিতে হইবে ? সে কাহারও সহিত ইচ্ছামত মিশিতে. খেলিতে পাইবে না,—অস্পৃশ্য প্রাণীর মত দূরে দূরে থাকিবে, কেন—একি অন্যায় ? না, যে পারে সে এ ব্যবস্থা মানিয়া চলুক, একাদশী ইহা সহ্য করিতে পারিবে না, কিছুতেই না!

তীব্র বিষাদ তাহার মনের মধে ক্রমশঃই ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল, এমন নিষ্ঠুর অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাহার মনটা অত্যন্ত বিরূপ হইয়া দাঁড়াইল! না, সে একলাই ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে, না থাক সাহায্য, নাথাক সম্বল, সমস্ত ধাক্কা সে একলাই সাম্‌লাইবে।

(ক্রমশঃ)

ভুত না মানুষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

এই সব চিন্তা ও যন্ত্রণা না সহ্য করিতে না পারিয়া চন্দনী অবসন্ন দেহে একমাত্র ব্রহ্মাণ্ডপতিরই শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহাকে ডাকিতে না ডাকিতেই তাঁহার চিন্তা জনিত অবসন্নতা অনেকটা হ্রাস প্রাপ্ত হইল। তিনি দেখিতে লাগিলেন চারি দিকেই তাঁহার নিজের বস্তু, নিজের জন। মস্তকের উপর উজ্জল চন্দ্রাতপ, সম্মুখে কলনাদিনী নদী, পার্শ্বে ও পশ্চাতে নানা-বিধ উদ্ভিজ্জ বস্তু, ফল,ফুল,বৃক্ষ,লতা, পাতা ইত্যাদি। এ সমুদয়ই তাঁহার মনোস্তুষ্টির জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, আর এই সকলের মধ্যে কে একজন দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার মনে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন। অনেক-ক্ষণ পরে চন্দনী স্থির হইলেন,অঞ্চল দ্বারা ঘর্ম্ম জল মুছিয়া ফেলিলেন এবং সন্ধ্যা সমাগতা দর্শন করিয়া হস্তপদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক সন্ধ্যাহ্নিকে মনোনিবেশ করি-লেন। সন্ধ্যাহ্নিক করিতে করিতে অনশনা চন্দনী কখন যে নিদ্রাতুরা হইয়া নদীতীরে ঢলিয়া পড়িলেন তাহা তিনিও বুঝিতে পারিলেন না।

যখন তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল তখন রজনী প্রভাত হইয়া গিয়াছে। তিনি দেখিলেন তিনি একটী কুসুমিত বনে দূর্ব্বা আস্তরণের উপরে শায়িতা রহিয়াছেন।

নিদ্রাভঙ্গ হওয়া মাত্রই চন্দনী উঠিয়া বসিলেন। এ স্থান যে তাঁহার অপরিচিত নহে, যে কুসুমিত বনের মধ্যে দেবদত্ত লুক্কায়িত ছিলেন এবং যে বনের মধ্যে দেবদত্ত দুই জনের শব দেহ ও শব-দেহ বহনকারীদিগকে দেখিয়াছিলেন এ সেই বন।

চন্দনী উঠিয়া বন হইতে বহির্গতা হইলেন। সম্মুখেই সেই চণ্ডদেবের গৃহ, তিনি যতদুর সম্ভব দ্রুতপাদ বিক্ষেপে সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কেন যে তিনি এরূপ ভাবে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেন তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার অধিক ভাবিবার সময় অথবা শক্তি ছিল না। তিনি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া চণ্ডদেবের শয়ন কক্ষের সম্মুখে আসিলেন। চণ্ড-দেবের শয়ন কক্ষের দ্বার মুক্ত ছিল তদ্দর্শনে চন্দনী আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। কারণ "ফকিরের ফন্দি" ও "মৃত ব্যক্তির বক্তৃতা"র পর সে কখনও দ্বার মুক্ত করিয়া শয়ন করে না।

সমস্ত দেহ আবরণ করিয়া চণ্ডদেব শয্যার উপর শয়ন করিয়া গভীর নিদ্রাভি-

ভূত রহিয়াছে এ ঘটনাও চন্দনীর মনে আশ্চর্য্যের ভাব আনয়ন করিল, কারণ ইদানীং চণ্ডদেবের গাঢ় নিদ্রার অভাব দৃষ্ট হইত এবং সে দেহ বস্ত্রাবৃত করিতে ভাল বাসিত না।

চন্দনীর ইচ্ছা হইল চণ্ডদেবকে জাগাইয়া বাক্যালাপ করেন কিন্তু তাঁহার সাহস হইল না। তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাতার কক্ষে গমন করিলেন, তিনি কিন্তু সেখানে মাতাকে দেখিলেন না। একজন দ্বার রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে গত কল্য নন্দকের সঙ্গে নন্দকের মাতা তাঁহার ও চণ্ডদেবের অনুসন্ধানে বহির্গতা হইয়া গিয়াছেন। চণ্ডদেবও চন্দনীর মতই শত্রু কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিল এবং চন্দনীর আগমনের অলক্ষণ অগ্রে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক গৃহে আসিয়া নিদ্রাগত হইয়াছে।

তখন চন্দনী বুঝিতে পারিলেন যে চণ্ডদেবও তাঁহার মতন শত্রু কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছিল এবং তাঁহার মত দৈব অনুগ্রহে মুক্তি লাভ করিয়া আসিয়াছে। গত রাত্রিতে নন্দক মাতাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদেরই অনুসন্ধানার্থ বাহির হইয়াছে। তিনি তখন শত্রু কর্ত্তৃক বিশৃঙ্খলিত নিজ গৃহটী পুনরুদ্ধার করিতে বসিলেন এবং সে কার্য্য সংক্ষেপেই সমাধা করিয়া স্নান ও তৎপরে পানাহার পূর্ব্বক নিজ গৃহে উপবেশন পূর্ব্বক গীতা অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। তখন প্রায় মধ্যাহ্ন। সহসা চন্দনীর অধ্যয়ন কার্য্যে বাধা প্রদান করিয়া ৩০ জন লোক আসিয়া চন্দনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। চন্দনী তাহাদিগকে দেখিবা মাত্র চিনিতে পারিলেন। কারণ শৈশবাবধিই তিনি তাহাদিগকে দেখিতেছেন, তাহারা সকলেই চণ্ডদেবের বিশ্বস্ত ও প্রাচীন ভৃত্য ও গৃহ-রক্ষক।

তাহারা চন্দনীকে কহিল "কর্ত্তা আমাদিগকে কায হইতে কেন যে বরখাস্ত করিলেন তাহা কিছুই বুঝিলাম না।"

চন্দনী অতীব বিস্ময় সহকারে কহিলেন "তোমাদিগকে জবাব দিলেন তবে অতঃপর কে তাঁহার কায ও বাড়ী রক্ষা করিবে?"

তাহারা কহিল "তিনি নূতন লোক রাখিলেন।"

চন্দনী ভীতা ও চকিতা হইয়া চণ্ডদেবের নিকট যাইতে চাহিলেন। কিন্তু অনেক নূতন লোক চণ্ডদেবের নিকট আসিয়াছে জানিতে পারিয়া তাহাতে বিরত হইলেন. কিন্তু এই সব প্রাচীন ও বিশ্বস্ত লোকদিগকে চণ্ডদেব বরখাস্ত না করেন এইরূপ অনুরোধ করিয়া তাহার নিকট একখণ্ড পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তাহাতে কোন সুফল ফলিল না। চন্দনীর চিঠির উত্তরে চণ্ডদেব এইরূপ পত্র লিখিয়াছিল।

"আমি যে শত্রু কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিলাম তাহা তুমি জান। এই সব ঘটনায় আমি আমার পুরাতন সমুদয় লোকের উপরই বিশ্বাস হারাইয়াছি এবং ইহাদিগকে বিতাড়িত করার এই প্রধান

কারণ। অতএব এ বিষয়ে তুমি আর অধিক অনুরোধ করিবে না এই আমার অনুরোধ।"

চন্দনী ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন। আগন্তুকগণ চণ্ডদেবের গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সংবাদ।

১। গুজরাটে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা হইয়াছে। এতদিন গুজরাট হইতে বোম্বাইয়ে গবাদির ঘাস, খড় চালান হইত। এক্ষণে গুজরাটের দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে উহা পাঠান হইতেছে।

২। বরোদা গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের সূত্রপাতেই প্রজা সমূহের প্রাণ রক্ষার্থ যে আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। বরোদা রাজ্যের আম্‌রেলি নামক স্থানের রাজস্ব সচীব প্রজাদের অন্নক্লেশ দূর করিবার জন্য সরকার হইতে ৬০ হাজার টাকা প্রার্থনা করিয়াছেন। সরকার হইতে আহার্য্য দ্রব্য সকল সস্তাদরে বিক্রয়ের নিমিত্ত অনেকগুলি দোকান খুলিবার জন্য একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে। বরোদা ষ্টেট বোম্বাই হইতে ৬০ হাজার টাকায় খড় কিনিয়া রাখিয়াছেন। বরদা রাজ রাজ্যের গৃহ পালিত পশুগুলিকেও অনাহারে মরিতে দিবেন না।

৩। বিহার ও উড়িষ্যার ছোট লাট স্যার চার্লস বেলি মহোদয় ১৯শে নবেম্বর স্যার এডওয়ার্ড গেইটকে তাঁহার কার্য্যভার বুঝাইয়া দিয়া স্বদেশ যাত্রা করিবেন।

৪। কলিকাতার পাটের কলে এক্ষণে প্রচুর পরিমাণে থলিয়া প্রস্তুত হইতেছে। গত মাসে ৫ কোটী ৮৩ লক্ষ থলিয়া বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময় ইহার অর্দ্ধেকও প্রেরিত হয় নাই।

৫। মিঃ কেয়ার হার্ডি।—গত ২৬শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা কেয়ার হার্ডির মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ভারতবাসিদিগের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, পার্লেমেণ্ট মহাসভায় ভারতবাসিদিগের পক্ষ হইয়া অনেক প্রশ্ন উত্থাপন ও আলোচনা করিতেন। ১৯০৭ সনে তিনি ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। এতদ্দেশীয় জননায়কগণের সহিত তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অনেক প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি এক গরীব সূত্রধরের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা দুই জনেই স্কচ। ১৮৫৬ সনের ১৫ই আগষ্ট স্কটল্যাণ্ডে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি লেবার-লিডার নামক এক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বাধীন শ্রমজীবী দলের নেতা ছিলেন। পার্লেমেণ্ট মহাসভায় এই দলের মুখপত্র হইয়া আন্দোলন করিতেন। এই স্বদেশ প্রেমিক, অক্লান্তকর্ম্মী, উদার-হৃদয় মহাত্মার মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

৬। সুইজারল্যাণ্ডে আজকাল যে

ঘড়ির প্রচলন হইয়াছে তাহাতে কাঁটা নাই, একটী বোতাম টিপিলেই যখন যে সময় হইয়াছে তাহা মানুষের কথার ন্যায় বলিয়া দেয়।

গৃহকর্ম্ম।

পেস্তা ও বাদামের মোহনভোগ।

দ্রব্যের পরিমাণ—পেস্তা ও বাদাম বাটা এক পোয়া, চিনি দেড় পোয়া, ঘৃত দেড় পোয়া।

প্রস্তুত প্রণালী—পেস্তা ও বাদাম পরিষ্কার সিলে ভাল করিয়া বাটিয়া লইয়া চিনির একতার বন্ধ রসে পেস্তা ও বাদাম বাটা দিয়া হাতা দ্বারা নাড়িতে থাক। গাঢ় হইয়া আসিলে তাহাতে ঘৃত ঢালিয়া দিয়া পুনরায় হাতা দ্বারা নাড়িতে থাক। খুব ঘন ক্ষীরের মত হইয়া আসিলে অল্প একটু কর্পূর ছড়াইয়া দিয়া নামিয়া রাখ। তাহা হইলেই পেস্তা বা বাদামের মোহন ভোগ প্রস্তুত হইল।

মুগের বরফি।

দ্রব্যের পরিমাণ—মুগ বাটা এক সের, ঘৃত তিন পোয়া, চিনির রস একসের, জাফরাণ আট আনা, ধনে বাটা আধ ভরি, মরীচ গুঁড়া এক তোলা।

প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃতকে ফেনাইয়া সাদা করিবে পরে ঐ ঘৃতের সহিত মুগ বাটা, ধনে বাটা, মরীচ গুঁড়া ও জাফরাণ মিশাইবে। উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে ঐ মুগকে অল্প জালে ভাজিয়া লাল করিয়া লইবে। পরে সাড়ে তিনতার বন্ধ চিনির রস প্রস্তুত করিয়া নামাইয়া নাড়িতে থাকিবে। নাড়িতে নাড়িতে সাদা হইলে ঐ ভাজা মুগ তাহাতে দিয়া ভাল করিয়া মিশ্রিত করিয়া কানা উচু পাথে ঢালিয়া রাখিবে। অল্প শুষ্ক হইয়া আসিলে ছুরী দ্বারা বরফির আকারে কাটিয়া লইবে।

আদার মোহনভোগ।

দ্রব্যের পরিমাণ—এক সের আদা, আধ সের ঘৃত, চিনি দেড় সের, ময়দা এক ছটাক।

প্রস্তুত প্রণালী—আদা ছাড়াইয়া জলে সিদ্ধ করিয়া বাটিয়া লইবে। পরে আদা-বাটার সহিত ময়দা মিশাইয়া ঘৃতে ভাজিয়া এক তার বন্ধ চিনির রসে মৃদু জালে পাক করিলেই উৎকৃষ্ট মোহনভোগ প্রস্তুত হইবে। গুরুতর আহারের পর ইহা অতি সুপথ্য। পূর্ব্বদিন গুরু আহার হেতু পেট ভারি থাকিলে ও দাস্ত খোলসা না হইলে এই মোহন ভোগ আধ ছটাক খাইলে সকল অসুখ সারিয়া যায়।

ডিমের জিলাপী।

দ্রব্যের পরিমাণ—হংসডিম্ব বারটা, ঘৃত দুই ছটাক, চিনির রস দেড় পোয়া,

লেবুর রস একপোয়া, লবণ এক আনা, জাফরাণ এক আনা, দারুচিনি দুই আনা, ছোট এলাইচ চূর্ণ দুই আনা, লবঙ্গ চূর্ণ দুই আনা।

প্রস্তুত প্রণালী—অগ্রে লেবুর রসের সহিত চিনির দুইতার বন্ধ রস প্রস্তুত করিবে। রস উনানে থাকিতে থাকিতে ডিম্বের হরিদ্রাংশ বাহির করিয়া তাহাতে লবণ ও মসলা মিলাইয়া হস্ত দ্বারা খুব ঘাঁটিবে। তৎপরে রস উনান হইতে নামাইয়া ঘৃত উনানে চড়াইবে, ঘৃতপাক হইলে ঐ প্রস্তুত ডিম্ব একখানি মোটা নেকড়ায় ঢালিয়া পুঁটলী বাঁধিয়া তাহার তলায় অল্প একটু ফুটা করিয়া কড়ার ঘৃতে জিলাপীর আকারে ছাড়িবে। বেশ লাল মত ভাজা হইলে পূর্ব্ব প্রস্তুত গরম রসে ছাড়িবে। অধিক ভাজা হইলে চুঁইয়া যাইবে সুতরাং সাবধান হইয়া ভাজিবে।

বামারচনা।

তাজমহল।

প্রেমের গৌরব স্মৃতি তুমি এই ভূমণ্ডলে।
মহিয়সী মমতাজে ধরি চারু বক্ষস্থলে॥
পত্নীর সম্মান তরে বাদশাহ সাজাহান।
অপূর্ব্ব গঠনে তোমায় করেছে নিরমান॥
পৃথিবীর নরনারী নিরখি বিস্মিত হয়।
এ শিল্প প্রণালী যেন ইহ জগতের নয়॥
ধন্য সাজাহান তব পত্নী-প্রেম চমৎকার।
রাখিলে অক্ষয়কীর্ত্তি ভরিয়ে সংসার॥
অদম্য উৎসাহে ভরে অজস্র অর্থের ব্যয়ে।
এ হেন প্রণয় স্মৃতি রাখেছ যে জাগাইয়ে॥
পরলোক হ'তে তব প্রেমময়ী মমতাজ।
না জানি কি প্রীতি নেত্রে নিরখিছে তোমা আজ॥
ধন্য সেই গরীয়সী মহিলা জগৎমাঝ।
ধন্য পত্নী পরায়ণ! তুমি গো যবনরাজ॥
পবিত্র প্রেমের তার লভি হেন প্রতিদান।
শ্রেষ্ঠ নারীকুল মাঝে লভিলা নব আসন॥
সাজাহান সম প্রেমে সমগ্র ধরণীতলে।
ধরি যত নর সবে পবিত্র স্মৃতির বলে॥
নিজেরে করিয়ে ধন্য তাহারেও ধন্য করে।
পরলোকগতা সেই অর্দ্ধ-অঙ্গ ভাগিনীরে॥

জীবন সমস্যা।

দুটী আত্মা দুই স্থানে,
পরস্পরে নাহি জানে;
একীকৃত এ জীবনে,
শুভ প্রেম সম্মিলনে।
কেবা করে এ মিলন,
কোথা হ'তে এ বন্ধন?

আকাঙ্ক্ষা।

খুলি হৃদয়ের দ্বার অনন্ত সৌন্দর্য্য সার
অধিষ্ঠিত যে দেবতা অন্তর মাঝার।
নিন্দি চারু কোকনদ তাঁহার যুগল পদ
ভাসাতে মানসে মম সাধ অনিবার॥
সতত বাসনা জাগে প্রেম ভক্তি অনুরাগে
দিবানিশি ধরি সেই অমল চরণ।
মানস মন্দিরে রাখি সতত জুড়াই আঁখি
উপাস্য দেবতা মম সুন্দর গঠন॥
সুশীতল করি চিত্ত নেহারি তাঁহারে নিত্য
প্রেম অনুরাগে দীপ্ত অতুল আনন।
আমি যে গো জ্ঞানহীনা পাপ তাপে বিমলিনা
তথাপি হৃদয়ে কেন বাসনা এমন॥
যে মূর্ত্তি হৃদয়ে জাগে তাঁহারে আঁখির আগে
জীবনে মরণে মম করিতে দর্শন।
হে বাসনা পূর্ণকারী হৃদয় বিহারী হরি
পুরাও গো! অধিনীর এই আকিঞ্চন॥
শুধু দরশনে চিত্ত নাহি হয় পরিতৃপ্ত
রমণী হৃদয়ে প্রভু অনন্ত পিপাসা।
পরাণে মিশাতে চাহে আপনাতে
ধরে হৃদি তলে এ কেন দুরাশা॥
দাও হৃদয়েতে বল নারী জনম সফল
হয় যেন দয়াময় তোমার কৃপাতে।
পতিরূপে বিশ্বভূপে লভি যেন পূর্ণরূপে
এই নিবেদন প্রভু করি চরণেতে॥
লভি সে পরশমণি সম রাজ রাজেন্দ্রাণী
উজলিয়ে রাখি মানস-মনিতে।
শূন্য নাহি হয় যেন এই হৃদি সিংহাসন
পরিপূর্ণ করি সদা তোমার প্রেমেতে॥
জীবন কুসুম মম প্রফুল্ল মন্দার সম
না ঝরে ফুটিয়া থাকে এ হৃদি মরুতে।
লাগিয়া ধরার বায় যেন ম্লান নাহি হয়
তব স্নেহ ছায়াদানে কর প্রস্ফুটিত॥

মঙ্গলালয়!

যাহা কর তুমি মঙ্গলেরি তরে,
হে মঙ্গলালয়, এ ধরার পরে
ফোটে ফুল পুনঃ ঝরে বসুধায়
কেবা জানে কেন তোমারি ইচ্ছায়
জাগে রবি, তারা আঁধার ঘনায়,
নিদাঘের পর ঘন বরিষায়
ভরি দাও তুমি ধরণীর বুকে
রাখ পাশাপাশি সুখ আর দুঃখে।
নহে ব্যর্থ তাহা নহে অর্থহীন,
ফুটাও আঁধারে আলোক নবীন
মরণের মাঝে সাজাও অমৃত
মানবের সখা, মানবে বিস্মৃত
হও নাকো কভু রাখ বুকে বুকে
জীবনে মরণে, শোকে দুঃখে সুখে।

শ্রীমতী ক্ষীরোদ কুমারী ঘোষ।

অন্নপূর্ণা মাহাত্ম্য।

ভিখারী শঙ্কর ভ্রমি চরাচর
অন্ন বিনা অনাহারে।
যেই অমৃতান্ন পানে হ'লে ধন্য
জগন্মাতার করে॥
সেই অন্ন-বারি পরিপূর্ণা করি,
সদা এ জগত মাঝে।
রক্ষি নিজগুণে অন্নপূর্ণা সনে
সতত কর বিরাজ॥
সতীর গাথা রাখিতে অক্ষুন্ন
হের আজি কিবা প্রভু পরমেশ।
অন্নদা নিকটে যাচি করপুটে
ধরি অকপটে ভিক্ষুকের বেশ॥
সরম সম্ভ্রম অবলীলা ক্রমে
করি পরিহার আনন্দিত মনে।
ভিক্ষালব্ধ ধনে পরিতৃপ্ত প্রাণে
ধরিয়া যে শোভা করুণ নয়নে॥
বসুধা মাঝার হইল প্রচার
যে অপার কৃপা করুণার বলে।
কভু কদাচিত সে কৃপা বঞ্চিত
নাহি করি হীন পাতকী নরে।
ওই উদারতা ও উচ্চ প্রাণতা
করি শিক্ষাদান বিশ্ব চরাচরে॥

অপরাধী।

ওগো প্রভু! ওগো প্রিয়তম! হে মহান্ দেবতা আমার!
নিরন্তর অপরাধী দাসী মার্জ্জনা নাহিক জানি তার।
জানিয়া শুনিয়া করি পাপ না করিলে চখেনা ভাবিয়া,
তোমার প্রীতির ভাগে নাথ! প্রলোভনে মজি'ছে এ হিয়া।
কে রাখে এ দারুণ সংগ্রামে রক্ষা কর্ত্তা কেবা আছে আর
তোমা বিনা হে মহা সম্রাট! বন্ধুহীন বিপুল সংসার!
কোন দিন করি নাই নাথ! তোমার আদেশ মত কাজ,
বিপদে তোমারে ডাকিতেছি মনে মনে এই বড় লাজ!
কোন কিছু পারি না করিতে তোমার প্রীতির অনুষ্ঠান,
অথচ পাইনি তোমা, ব'লে দিবানিশি করি অভিমান।
তুমি যে বিশ্বের অধিপতি, তব যোগ্য কি আছে আমার,
অর্চ্চনা করিতে পদযুগে প্রদানিতে পূজা উপচার।
করিনি কিছুই তব তরে অনায়াসে শুধু চাই,
জ্ঞানকৃত এ পাপ দাসীর জন্মে জন্মে এর ক্ষমা নাই।

শ্রী—স।

৯৯ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।